ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

ফেব্রুয়ারি ২০২০ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনা

সাক্ষাৎ কার
ডক্টর কে. শিবান

ফোকাস
কৃত্রিম মেধা : ভারতে এর সুবিধা ও অসুবিধা
যোগেশ কে. দ্বিবেদী, সন্তোষ কে. মিশ্র, লরি হিউস

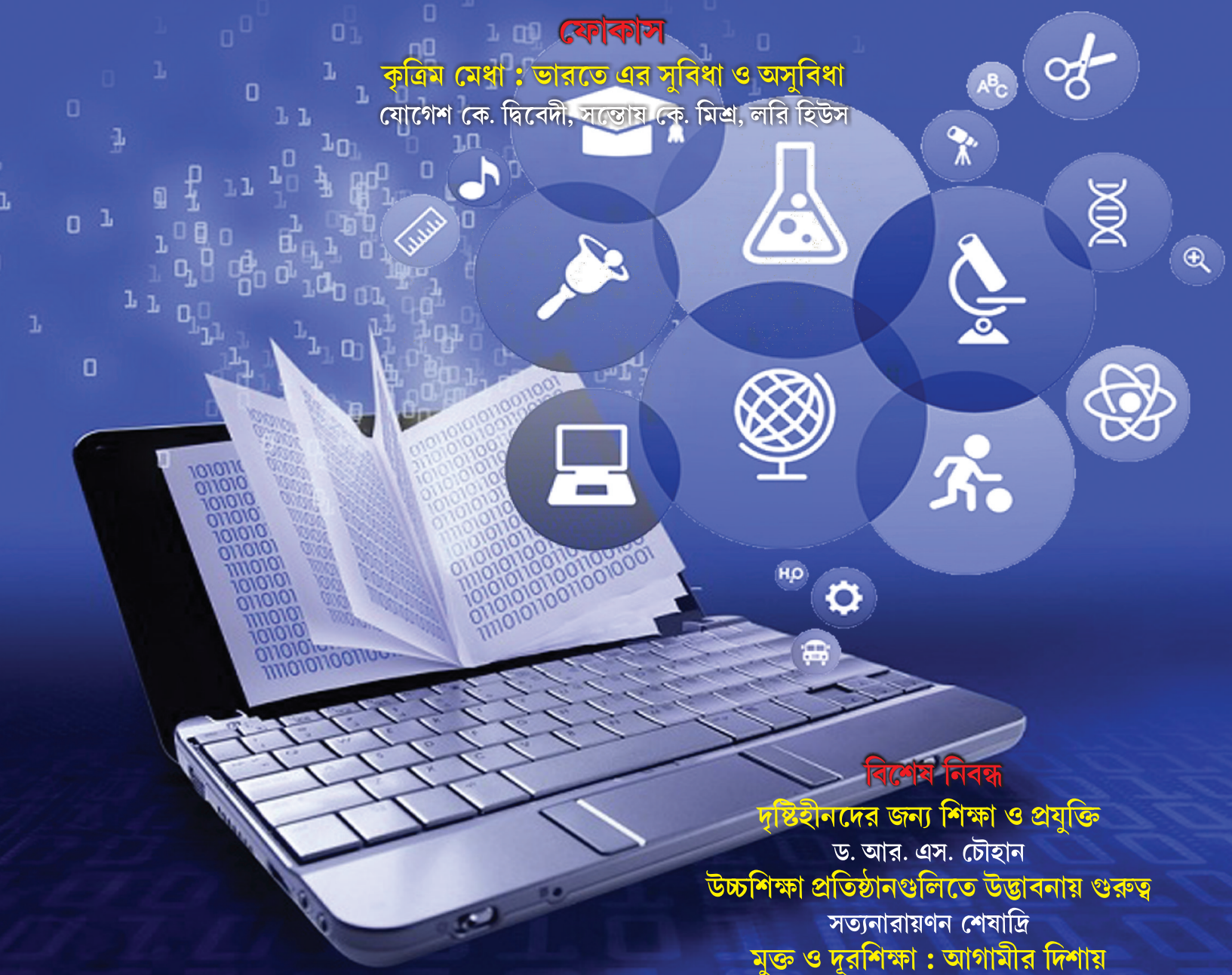

বিশেষ নিবন্ধ
দৃষ্টিহীনদের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তি
ড. আর. এস. চৌহান
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্ভাবনায় গুরুত্ব
সত্যনারায়ণন শেষাদ্রি
মুক্ত ও দূরশিক্ষা : আগামীর দিশায়
ড. কে. ডি. প্রসাদ

বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী

@PMOIndia

বেঙ্গালুরুর কৃষিবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৭-তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে ভারতের বিকাশগাথা। ভারতের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নয়া ভারতের দরকার প্রযুক্তি এবং সেই সঙ্গে এক যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতা, যাতে কিনা আমরা আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে নয়া দিশা দিতে পারি।" তার মতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সকলের জন্য সমান সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করে সমাজে ঐক্যসাধন করে। তিনি আরও বলেন, "একটা সময় ছিল যখন স্মার্টফোন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মুষ্টিগত ছিল; এখন তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের অগ্রগতির দৌলতে সস্তায় পাওয়া যায় স্মার্টফোন, কমেছে ডেটা কানেকশানের মাশুলও। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে তার ও সরকারের মধ্যে দূরত্ব কমেছে। এখন সে সরাসরি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারে।"

গ্রামোন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ের তথা উন্নতমানের উদ্ভাবনের সুযোগ অবাধ, তাই সেই ক্ষেত্রে নবীন বিজ্ঞানীদের কাজ করতে উৎসাহ দেন প্রধানমন্ত্রী।

My motto for the young scientists in this country has been - "Innovate, Patent, Produce and Prosper". These four steps will lead our country towards faster development.

... I am also happy to learn that India's ranking has improved in the Innovation Index to 52. Our programs have created more technology business incubators in the last five years than in the previous 50 years! I congratulate our scientists for these accomplishments.

(3 January, 2020)

ফেব্রুয়ারি, ২০২০

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেন্দ্র চৌধুরী**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যায়

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪
বিজ্ঞান শিক্ষা এবং উদ্ভাবন বিষয়ে উপরাষ্ট্রপতির বক্তব্য
বক্তৃতার উদ্ধৃতাংশ ৫

সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার : ডক্টর কে. শিবান ৭

বিজ্ঞানে নেতৃত্ব : চাই সাবেক ধারণায় রদবদল
ড. বিক্রম অম্বালাল সারাভাই ১০

ফোকাস
কৃত্রিম মেধা : ভারতে এর সুবিধা ও অসুবিধা
যোগেশ কে. দ্বিবেদী, সন্তোষ কে. মিশ্র, লরি হিউস ১৩

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্ভাবনায় গুরুত্ব
সত্যনারায়ণন শেষাদ্রি ১৯

বিশেষ নিবন্ধ
দৃষ্টিহীনদের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তি
আর. এস. চৌহান ২৪

শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ
সংকলন : যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী ২৮
মুক্ত ও দূরশিক্ষা : আগামীর দিশায়
ড. কে. ডি. প্রসাদ ৩১
সাইবার নিরাপত্তা : ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ
জি. পি. পান্ডে ৩৪
উচ্চশিক্ষায় আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব
নাতাশা ঝা ভাস্কর ৩৮
হোমস্টে-র মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জীবিকা সংস্থান
ড. রত্না ভুয়ান ৪১

বিশ্ব পুস্তক মেলা ২০২০
সংকলন : যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী ৫৮

নিয়মিত বিভাগ

জানেন কি? ১৭
উন্নয়নের রূপরেখা ৪৫
যোজনা ক্যুইজ ৪৬
যোজনা নোটবুক ৪৭
যোজনা ডায়েরি ৪৮

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

শিক্ষাক্ষেত্রে রদবদল

শিক্ষা এমন এক সদ্‌গুণ, অর্জনের পর যা আজীবন মানুষের সাথে থাকে। সামগ্রিক অর্থে দেখলে, শিক্ষিত মানবগোষ্ঠী বিশ্বের যেকোনও জাতির বৌদ্ধিক চেতনার ভাণ্ডার, বিকাশের চালিকাশক্তি তথা নৈতিকতার ধারক ও বাহক। শিক্ষাই হল সেই বস্তু, নানা বিষয়ে যা অর্জনের সূত্রে একটি সমাজের জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ উঠে আসেন; এবং একযোগে তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমৃদ্ধতর হয় সেই সমাজ।

শিক্ষা ব্যবস্থার চালু কাঠামো এবং শিক্ষণ পদ্ধতিতে নূতনত্ব যোগ করে উদ্ভাবনা। তা কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দরজাও হাট করে খুলে দেয় অনেকাংশে। চক-ডাস্টার এবং মুখে মুখে পড়ানোর মান্ধাতা মডেল ছেড়ে বেরিয়ে আধুনিক ডিজিটাল শিক্ষাদান সময়ের অনিবার্য দাবি। আগামীর পথ বলছে পাখি পড়ার মতো নির্জীব শিক্ষাগ্রহণ নয়, লেখাপড়া শিখতে হবে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে।

কোনও উদ্ভাবনা যত বেশি জটিলতাহীন, সহজে ব্যবহারযোগ্য, তথা কমদামি, তার কদর তত বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত উদ্ভাবনাসমূহকে বেশ দীর্ঘসময় ধরে কাজ চালানোর যোগ্য, রদবদলের উপযোগী এবং চটজলদি ফলাফল দেবে এমন গোত্রের হতে হবে। এজাতীয় উদ্ভাবনা, লেখাপড়ার এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলবে যা কিনা মৌলিক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতাকে উৎসাহ জোগাবে তথা সর্বোপরি সর্বার্থে একদম প্রান্তবাসী পড়ুয়াটির দোরগোড়াতেও শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

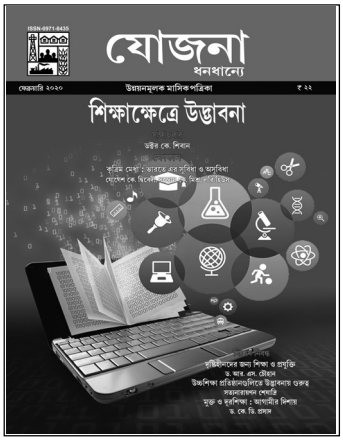

প্রযুক্তির দৌলতে ইতোমধ্যেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এই বহুপ্রতীক্ষিত উদ্ভাবনার মেলবন্ধন শুরু করেছে। আজ যদি আমরা আধুনিক মডেলের এই শিক্ষাদানের রীতি অনুসরণ করি, তবে আগামী প্রজন্ম নিঃসন্দেহে নিজেদের ভবিষ্যতকে সুষ্ঠুভাবে গড়েপিটে নেওয়ার মতো সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাবে। ফলে আজ আমাদের ঘরের পড়ুয়ারা যে পদ্ধতিতে শিক্ষার পাঠ নিচ্ছে তাতে আকাশ-পাতাল ভোলবদল ঘটবে। তারা কেবল চোখ চেয়ে দেখার পরিবর্তে অনুসন্ধিৎসু হবে, মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে জ্ঞান অর্জন করবে, স্রেফ কপি-পেস্ট থেকে বিরতি নিয়ে অন্বেষণ এবং উদ্ভাবনের রাস্তায় হাঁটবে। অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে। শিক্ষার সাথে উদ্ভাবনার যদি সঠিক মেলবন্ধন ঘটানো যায়, তবে তা অপার সম্ভাবনার বীজ বপন করে।

সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্ভাবনামূলক প্রকল্প এবং পদক্ষেপে প্রাথমিক শিক্ষা সবসময়ই এক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে হিসাবে চিহ্নিত। শিক্ষার অধিকার আইন থেকে শুরু করে সমগ্র শিক্ষা ইস্তক তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। পাশাপাশি, দেশে গবেষণা ক্ষেত্রে গতি আনতে ও উদ্ভাবনার সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও সরকার একগুচ্ছ নতুন প্রকল্প চালু করেছে। ড. কে. কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে গঠিত খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি সংক্রান্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। উল্লিখিত রিপোর্টে, শিক্ষার নাগাল, সমমান, উৎকর্ষ, ব্যয়ভার, দায়বদ্ধতার প্রশ্নে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তার নিদান খোঁজা হয়েছে। খসড়া নীতিতে স্কুল শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা ইস্তক সর্বস্তরে সংস্কারের সংস্থানের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, একেবারে খুদেবেলা থেকেই শিশুদের শিক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়াতে দৃষ্টি দিতে। এছাড়াও বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে মজবুত করা, তথা, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক কাঠামোর রদবদলে জোর দেওয়া হয়েছে। একটি জাতীয় শিক্ষা আয়োগ স্থাপন, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রযুক্তির চলন বাড়ানো, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত নজর প্রদান ইত্যাদি অন্যান্য সুপারিশগুলি মধ্যে অন্যতম।

সরকারি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সকল পড়ুয়াকে উৎকৃষ্ট গুণমানের শিক্ষা প্রদানে দায়বদ্ধ। এসব প্রতিষ্ঠানকে উদ্ভাবনমূলক প্রয়োজন-ভিত্তিক পঠনপাঠনের বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের ভোলবদলে নজর দিতে হবে। এই ভরতুকিপ্রাপ্ত শিক্ষাপীঠগুলি প্রান্তিক সামাজিক বা পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা-সহ অন্যান্য বহু শিক্ষার্থীর উচ্চাশাকেও স্বপ্নের উড়াল দিতে সক্ষম করে তোলে। সময়ের দাবি হল শিক্ষার এই মডেলকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সঙ্গে জোড়া। পাশাপাশি, বিশ্বের নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে ই-লার্নিং এবং শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচির মতো উদ্যোগের মাধ্যমে এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিশ্বের শিক্ষা দরবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী। উদাহরণ হিসাবে নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো প্রাচীন শিক্ষাপীঠগুলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। বর্তমানে দেশ অভূতপূর্ব সংখ্যক তরুণ জনসংখ্যার আশীর্বাদধন্য। শিক্ষায় সঠিক সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনসংখ্যা তত্ত্বগত এই সুফলকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এক সুদক্ষ, অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ যুবা কর্মীগোষ্ঠী গড়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

শ্রদ্ধেয় নেলসন ম্যান্ডেলা শিক্ষাকে সবচেয়ে ক্ষমতাধর হাতিয়ার হিসাবে অভিহিত করে বলেছিলেন যে, এই হাতিয়ারের ব্যবহারই বিশ্বে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। লিঙ্গ বৈষম্য নির্মূল, দারিদ্র্য হ্রাস, শান্তি কায়েম করে এই গ্রহকে সুস্থায়িত্ব প্রদান, অহেতুক মৃত্যু ও রোগব্যাধির প্রকোপ এড়াতে শিক্ষাই হল মূল চাবিকাঠি। আর যদি আমরা ভারতের প্রসঙ্গ টানি, তবে শিক্ষাক্ষেত্রের খোল-নলচে বদলে তাকে যুগোপযোগী করে তুলতে মূল হাতিয়ার হল উদ্ভাবনা।❑

বিজ্ঞান শিক্ষা এবং উদ্ভাবন বিষয়ে উপরাষ্ট্রপতির বক্তব্য

সংকলন : যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী

দুরূহ নানা সমস্যার মোকাবিলায় বিজ্ঞান অন্যতম হাতিয়ার। প্রযুক্তিগত বিকাশের মূল চাবিকাঠি বিজ্ঞানের প্রসার। কম বয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করেছেন উপরাষ্ট্রপতি এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু। তিরুবনন্তপুরমে 'জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস'-এ তার ভাষণে (৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯) উপরাষ্ট্রপতি যুক্তিবাদী এবং খোলা মনে সবকিছু বিচার করে দেখার মানসিকতা তৈরি করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন।

তার বক্তৃতার কিছু অংশ

'জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস'-এ উপস্থিত থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন National Council for Science and Technology Communication-এর অন্যতম কর্মসূচির মধ্যে পড়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজন।

ভালো লাগছে যে 'শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০১৯'-এ ''পরিচ্ছন্ন, পরিবেশ-বান্ধব, সচেতন ও স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন'' এই বিষয়টিকে 'কেন্দ্রীয় ভাবনা' হিসেবে রাখা হয়েছে।

আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে সারা বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল নবীন প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তি। তোমাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে সৃজনশীলতা এবং কল্পনার অমূল্য রত্নভাণ্ডার। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ. পি. জে. আব্দুল কালাম তার 'Ignited Minds' বইটিতে বলেছেন, ''স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন। স্বপ্ন রূপান্তরিত হয় চিন্তনে। চিন্তন জন্ম দেয় কর্মের।'' তোমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠুক এই শব্দগুলো।

ভারত হল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, এ কথা বলে ইতিহাস। যিশুর জন্মের ৫ হাজার বছর আগেও আমাদের আয়ুর্বেদ চিকিৎসাপ্রণালীর সাক্ষ্য মেলে। ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সেচ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন সিন্ধু সভ্যতার মানুষ। দক্ষিণ ভারতে গুণগত দিক থেকে উচ্চমানের পেটাই লোহা উৎপাদন হ'ত যিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাবের ২০০ বছর আগে থেকেই। 'শূন্য'-এর ধারণা ভারতীয়দেরই আবিষ্কার। মহাকাশবিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান সুবিদিত।

অমূল্য অবদান রেখে গেছেন আমাদের পূর্বসূরীরা। আর্যভট্টের 'আর্যভাত্তিয়াম' অসাধারণ এক জ্ঞানভাণ্ডার। বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ঋষি কণাদই প্রথম 'অণু' (পরমাণু)-র কথা বলেন তার 'কণাদসূত্র'-এ।

তরুণ মনে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উন্মেষে ব্রতী হতে হবে আমাদের। সেই উদ্যোগ ভবিষ্যতে দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব করবে। এটা বুঝতে হবে যে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের অগ্রগতি শুধুমাত্র পরীক্ষাগারে সীমাবদ্ধ থাকলে লাভ হবে না কিছুই। গবেষণা এবং আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে হবে সাধারণ মানুষের সামনে থাকা সমস্যার সমাধানে।

'যোগ'-এর জনক হলেন পতঞ্জলি। প্রাচীন ভারতের এইসব চিন্তাবিদরা সমৃদ্ধ করেছেন সারা বিশ্বের বিজ্ঞান ক্ষেত্রকে। আমরা গর্বিত তাদের জন্য। এই অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার ভাগ করে নিতে হবে বিশ্বের সঙ্গে।

আধুনিক যুগেও ভারতীয়রা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। বিংশ শতকের প্রথমদিকে প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'বোসন', প্রফেসর সুব্রহ্মনিয়াণ চন্দ্রশেখরের 'চন্দ্রশেখর লিমিট', স্যার সি. ভি. রমণ-এর 'রমণ এফেক্ট', প্রফেসর জগদীশচন্দ্র বসু-র 'বেতার' আবিষ্কার আলোড়িত করেছে বিশ্বের বিজ্ঞান অঙ্গনকে। আসলে, ভারতে প্রতিভার খামতি নেই। দরকার শুধু উদ্ভাবন-মূলক কাজের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা।

বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল মানুষের জীবনযাপনে সহজসাধ্যতা নিয়ে আসা। এই বিষয়টি বোঝাতে হবে শিক্ষার্থীদের। তরুণ মনে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উন্মেষে ব্রতী হতে হবে আমাদের। সেই উদ্যোগ ভবিষ্যতে দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব করবে। এটা বুঝতে হবে যে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের অগ্রগতি শুধুমাত্র পরীক্ষাগারে সীমাবদ্ধ থাকলে লাভ হবে না কিছুই। গবেষণা এবং আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে হবে সাধারণ মানুষের সামনে থাকা সমস্যার সমাধানে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং উষ্ণায়নের বিপদ এখন সারা বিশ্বের সামনে। স্থায়ী সমাধান চাই। সমান গুরুত্বপূর্ণ হল প্রকৃতি ও পরিবেশের সংরক্ষণ। বিজ্ঞান কঠিন সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার। সেজন্যই, দেশ ও জাতির উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হল বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার।

অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত বিবর্তনের যুগে বাস করছি আমরা। শিশুদের মনে প্রথম থেকেই জাগিয়ে তুলতে হবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, যা হল উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টার ভিত্তি। বিজ্ঞান শিক্ষা শিশুদের যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলবে। তারা কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে প্রাধান্য দেবে বিশ্লেষণ এবং গঠনাত্মক আলোচনা ও আদান-প্রদানে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি, যা ধারাবাহিক বিকাশের পথ দেখায়। প্রযুক্তির যথার্থ প্রয়োগ মানুষের জীবনযাপনকে উন্নীত করতে পারে। উপার্জন বৃদ্ধিরও পথেও তা সহায়ক।

উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের প্রশ্নে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম সারিতে। বিশ্বের উদ্ভাবন মঞ্চে আগামী দিনে ভারতের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে পারে তোমাদের বৌদ্ধিক অবদান।

ভারতকে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে একই সারিতে বসানোর উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। দেশের ৩০ কোটি নবীনের সার্বিক প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে সমবেত আগামী ভারতের বিজ্ঞানজগতের কুশীলবেরা। অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান, সক্ষমতা, সংকল্পবদ্ধতা, ধৈর্য এবং সাহস নিয়ে এগিয়ে যাও স্বপ্নের দিকে। খুলে দাও আবিষ্কারের নতুন দিগন্ত। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।❑

সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো

সাক্ষাৎকার : ডক্টর কে. শিবান

''আজকের দিনে একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অপরিহার্য অঙ্গ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার এবং মানবজীবনের গুণমান সুনিশ্চিত করতে এর কোনও বিকল্প নেই। এদিক থেকে বিচার করলে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার বাড়তি তাৎপর্য রয়েছে।'' —ডক্টর কে. শিবান

ইসরো বা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ডক্টর কে. শিবানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ। যোজনার বেঙ্গালুরু প্রতিনিধি বি. কে. কিরণমাই ই-মেলে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন।

আজকের দিনে একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অপরিহার্য অঙ্গ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার এবং মানবজীবনের গুণমান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিন্ত করতে এর কোনও বিকল্প নেই। এদিক থেকে বিচার করলে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার বাড়তি তাৎপর্য রয়েছে।—ডক্টর কে. শিবান

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কর্মসূচির পথিকৃৎ ডক্টর বিক্রম এ. সারাভাই মনে করতেন যে মহাকাশবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানবসমাজের প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব। কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট চালিত আমাদের শিক্ষামূলক এক্সপেরিমেন্ট বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক পরীক্ষামূলক (SITE) প্রয়াসের তকমা পেয়েছে। শিক্ষার বিস্তারই ছিল সাইটের মূল উদ্দেশ্য। বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছে শুনতে চাই।

দর্শক সংখ্যার মাপকাঠিতে সাইট সত্যিই বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক প্রয়াস হয়ে উঠেছিল। উপগ্রহবাহিত ইসরোর এই যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা ১৯৭৫-'৭৬ সালে ৬-টি রাজ্যের ২৪০০-টি গ্রাম উপকৃত হয়েছিল। এই প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে প্রায় ১০ ফুট ব্যাসের তথাকথিত 'চিকেন মেস' অ্যান্টেনা স্থাপিত হয়, যার সাহায্যে সরাসরি একটি স্যাটেলাইট থেকে বিশেষ ধরনের টেলিভিসন সেটে সিগন্যাল পৌঁছয়। স্বাস্থ্য, প্রাথমিক চিকিৎসাবিধি, পরিবার কল্যাণ ও কৃষি বিকাশের মতো বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান গ্রামাঞ্চলের দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসারে তথা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আমাদের দেশে টেলি-যোগাযোগ, টেলিভিসন সম্প্রচার ও জলবায়ু পর্যবেক্ষণ পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে যে দ্রুত বিস্তার ঘটেছে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সাইটের অভিজ্ঞতাই তার সূচনা করেছিল।

এক সময় ইসরো টেলি-যোগাযোগ শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এডুস্যাটের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কীভাবে এর সূত্রপাত? এ জাতীয় আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল?

এডুস্যাট কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় উপগ্রহবাহিত টেলি-যোগাযোগ ও টেলি-ভিসন সম্প্রচারের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবার পর। মূল্যবান এই অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল সাইট প্রকল্পের এবং

পরবর্তী ধাপে সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যাপেল ও ইনস্যাটের। গত শতকের নব্বই দশকে স্যাটেলাইটের সাহায্য নিয়ে দেশের সর্বত্র অসংখ্য অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষককে সুশিক্ষিত করে তোলা।

ছাত্রসমাজের সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলি কী এটা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী ধাপে এডুস্যাট চালু করার প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যায়। GSAT-3 বা এডুস্যাটের আওতায় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য আমাদের নিজস্ব GSLV-র সাহায্যে একটি ডেডিকেটেড উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। এর ফলে প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয় শিক্ষাক্ষেত্রেই আরও বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়। অনুষ্ঠানগুলি তৈরি করা হয়েছিল প্রধানত আধা-শহর ও গ্রাম এলাকায় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে। এডুস্যাট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপগ্রহচালিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ধারাটি এমনকি আজকের দিনের অব্যাহত রয়েছে।

স্যাটেলাইট গড়ে তোলার বিষয়ে ইদানীং ইসরো ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে। ইসরোর এই প্রয়াসের কী উদ্দেশ্য?

মহাকাশ অভিযান ও স্যাটেলাইট সম্পর্কে আমাদের ছাত্রসমাজ, বিশেষ করে যারা এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তাদের আগ্রহী করে তুলতে ইসরোর সক্রিয়তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র (ন্যানো) স্যাটেলাইট তৈরির ব্যাপারে ইসরো ছাত্রদের উৎসাহ জোগাচ্ছে এবং আমাদের সদা বিশ্বস্ত উৎক্ষেপণ যান পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (PSLV)-কে এই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া স্যাটেলাইট তৈরির নকশা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও হাতে-কলমে পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের নানাভাবে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এখনও অবধি দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দ্বারা নির্মিত দশটি উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর দ্বারা একদিকে স্যাটেলাইট তৈরির জটিল অনুষঙ্গগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিতি ঘটেছে অন্যদিকে, তারাই আবার পরবর্তী পেশাদারি জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে উদ্দীপিত হয়েছে।

সম্প্রতি ইসরোর সদর কার্যালয় থেকে 'ধ্রুব'-কে (মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রকল্প) মহাকাশে পাঠানো হল। এটির ভূমিকা কী হবে?

প্রধানমন্ত্রী উদ্ভাবনমূলক শিক্ষণ প্রকল্প বা ধ্রুব-কে একটি অভিনব কর্মসূচি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। গোড়ায় এই কর্মসূচির অভিমুখ ছিল বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে-মেয়েদের বেছে নিয়ে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিধিকে আরও বাড়ানো। এজন্য প্রতিভাবান শিশুদের পূর্ণ বিকাশের স্বার্থে দেশের উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হবে। অর্থাৎ, ধ্রুব-র প্রধান ভূমিকা হল উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ছেলে-মেয়েদের আরও এগিয়ে যাবার একটি মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া। বিজ্ঞান, ললিতকলা, সৃজনশীল রচনা ইত্যাদি সব ধরনের শিশু প্রতিভার বিকাশে ধ্রুব অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। এভাবে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানো ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর আজকের এই শিশুদের দ্বারাই সমাজ গঠনের বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। আশা করা যায় এদের এই উৎকর্ষ অর্জন আগামী দিনে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতিকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

ধ্রুব কর্মসূচিতে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে, কারণ এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিশুদের অংশগ্রহণ রয়েছে। এই শিশুরাই আবার দেশের ৩৩ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর সামনে 'আলোকবর্তিকা' (beacon) হয়ে উঠে তাদের সামনে অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করবে। প্রধানমন্ত্রীর 'ভিসন'-কে বাস্তবায়িত করতে সরকারের এই পদক্ষেপকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আরও আনন্দিত এই কারণে যে ধ্রুব কর্মসূচির সূচনা হয়েছে ইসরো কার্যালয় থেকে।

কৃষক পরিবারের সন্তান হবার দরুন গ্রামজীবনের সঙ্গে আপনার নিবিড় সম্পর্ক। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন হল ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। এই লক্ষ্যপূরণে কৃষকদের মধ্যে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার প্রসারে মহাকাশ প্রযুক্তির কী ভূমিকা থাকবে বলে আপনি মনে করেন?

সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে কৃষকদের কল্যাণে মহাকাশ প্রযুক্তির বিকাশ ও সদ্ব্যবহারকে ইসরো সর্বদাই গুরুত্ব দিয়েছে। সাইটের অনুষ্ঠানগুলি সম্প্রচারের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষায় এমন সব টেলিভিসন প্রামাণ্য চিত্র প্রযোজনার উপর যাতে করে উন্নততর কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অ্যাপেল ও ইনস্যাট

ইসরো-র চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান সচিব ড. কে. শিবানের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৯৮২ সালে ইসরো-তে যোগদান করার পর ডক্টর কে. শিবান পিএসএলভি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। অ্যারোস্পেস এঞ্জিনিয়ারিং, মহাকাশ পরিবহণ, সিস্টেমস এঞ্জিনিয়ারিং, উৎক্ষেপণ যান ও মিশন নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

End-to-end মিশন পরিকল্পনা ও নকশা প্রস্তুতি, সংহতকরণ ও বিশ্লেষণসাধনে ডক্টর শিবানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার উদ্ভাবনী কৌশলের দরুনই PSLV ধারাবাহিকভাবে সফল কর্মক্ষমতার পরিচয় রেখেছে। এই সফলতাই আবার ইসরো-র অন্যান্য উৎক্ষেপণ যানকে নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পেরেছে। 'সিতারা' নামাঙ্কিত 6D trajectory simulation software যা কিনা ইসরো-র উৎক্ষেপণ যানগুলির মেরুদণ্ডসদৃশ তার মুখ্য স্থপতি এই প্রযুক্তিবিদ। রকেট উৎক্ষেপণে ডক্টর শিবানের উদ্ভাবন কৌশলের প্রভাবেই এখন আবহাওয়ায় ভিন্নতা-নির্বিশেষে যেকোনও দিনে উৎক্ষেপণ সম্ভব হচ্ছে। তারই সুযোগ্য নেতৃত্বে PSLV-র একটি সিঙ্গল বা একক মিশনে ১০৪-টি উপগ্রহকে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হয়। ডক্টর শিবান Doctor of Science (Honoris Causa)-সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সম্মানিত বা পুরস্কৃত হয়েছেন।

সূত্র : *www.isro.gov.in*

ব্যবহার করার সময় স্যাটেলাইট মারফত কৃষিকাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে টেলিভিসন প্রামাণ্য চিত্র পরিবেশিত হয়েছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। একইভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে কাজে লাগানো হয়েছে 'কল্পনা' ও 'ইনস্যাট থ্রি-ডি'-র মতো উপগ্রহগুলিকে। বলা বাহুল্য, কৃষিকাজে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধানের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট থাকায় আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীরা সহজেই শস্যক্ষেত্রে রোগজীবাণুর আক্রমণ চিহ্নিত করতে পেরেছেন; সক্ষম হয়েছেন চাষ এলাকার বিস্তার, শস্য ফলন ও মৃত্তিকার গুণমান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে; যার দ্বারা আখেরে কৃষকরাই নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন।

ইসরোর উদ্যোগে যে 'তরুণ বিজ্ঞানী প্রকল্প' (যুবিকা) শুরু হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য কী?

আজকের দিনে একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অপরিহার্য অঙ্গ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার এবং মানবজীবনের গুণমান সুনিশ্চিত করতে এর কোনও বিকল্প নেই। এদিক থেকে বিচার করলে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার বাড়তি তাৎপর্য রয়েছে। আমরা বাস করছি এমন এক সময়ে যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যত মহাকাশ প্রযুক্তির প্রভাব রয়েছে। 'যুবিকা' প্রকল্পের অন্যতম অভিমুখ হল মহাকাশ প্রযুক্তির মৌলিক জ্ঞানকে প্রসারিত করা, বিশেষ করে এই প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে তরুণসমাজকে আগ্রহান্বিত করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে যেখানে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা ও অভিজ্ঞতা পরিবেশন করা ছাড়াও গবেষণাগার পরিদর্শন, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও আলোচনা এবং ফিডব্যাক বা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। ইতোমধ্যেই গত বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত পক্ষকালব্যাপী যুবিকা আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত এলাকা থেকে আগত ১১০ জন নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণমূলক এই প্রশিক্ষণ প্রয়াসটি জাতীয় সংহতি প্রসারেরও সহায়ক।

মহাকাশে আজ অবধি ১০৪-টি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে ইসরো তার কর্মদক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে উৎক্ষেপণ প্রকৌশলের পারদর্শিতা যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ইসরোর আগামী দিনের প্রকল্পগুলিতে কোন কোন ক্ষেত্র গুরুত্ব পাবে?

আসন্ন মাসগুলিতে বেশ কয়েকটি যোগাযোগবাহিত ভূ-পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণকারী স্যাটেলাইট উৎক্ষিপ্ত করতে চলেছি। ইতোমধ্যেই মহাকাশে প্রদক্ষিণরত যেসব স্যাটেলাইট রয়েছে তাদের পরিষেবা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই এটা করা হবে। একইসঙ্গে নতুন যেসব উপগ্রহ পাঠানো হবে সেগুলির পরিষেবা ক্ষমতা আগের তুলনায় বাড়ানো হবে।

চলতি বছরেই ল্যান্ডার ও রোভার-সহ চন্দ্রযান-৩ মিশনের অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে আমরা সচেষ্ট থাকব। এছাড়া সূর্য-ভিত্তিক এক সমীক্ষায় আমরা আদিত্য-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার পরিকল্পনা নিতে চলেছি। এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে ২০২২-এর মধ্যে গগনায়ণ কর্মসূচি (ভারতীয় মানব মহাকাশ অভিযান বা IHSP) সম্পন্ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ রেখেছেন। এটি এক অত্যন্ত কঠিন প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ যা বাস্তবায়িত করতে আমাদের আন্তরিক প্রয়াস শুরু হয়েছে।

২০২৪-'২৫ সালের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার বা ৫ লক্ষ কোটি ডলারে পরিণত করার লক্ষ্য সামনে রয়েছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত শিক্ষা ও উপকরণের কী ভূমিকা হবে?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাজসরঞ্জামই হল দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। টেলি-যোগাযোগ, টেলিভিসন সম্প্রচার, জলবায়ুর পূর্বাভাস, শিক্ষামূলক প্রয়াস, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবহণ ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামো ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আজ যে ধরনের দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে তার নেপথ্যে রয়েছে মহাকাশ প্রযুক্তির বিশিষ্ট অবদান। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও এখন এই প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি ব্রডব্যান্ড যোগাযোগ স্যাটেলাইট, ভূ-পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট ও নেভিগেশন স্যাটেলাইট সদ্ব্যবহারের ফলে দেশের বিকাশ সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতর হবে। এধরনের আরাধ্য কাজে সুদক্ষ মানবশক্তির চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং এই প্রক্রিয়ায় আমাদের বিজ্ঞানচর্চায় স্বদেশীকরণের পথ সুগম হয়ে উঠবে। এক কথায় বলতে হয় যে সুস্থায়ী ও যথোপযুক্ত উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কোনও বিকল্প নেই।

ইসরোর কর্মকাণ্ডকে বিস্তারিত করার লক্ষ্যে 'Samwad with Students' নামাঙ্কিত কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কর্মসূচিটির কাঠামো কী হবে?

আমাদের ছাত্রসমাজ, বিশেষ করে যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করছে তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলাটা খুবই জরুরি। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ছাত্ররা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় মিলিত হতে পারলে ছাত্রসমাজের মধ্যে অনুসন্ধানস্পৃহা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে ইসরোর বিজ্ঞানীদের অগ্রাভিযানে আমাদের ছাত্রসমাজ যাতে গর্ববোধ করতে পারে সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই শুরু হয়েছে Samwad with Students কর্মসূচিটি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকের প্রজন্মের সকল ছাত্র-ছাত্রী এমনকি যারা আধা-শহর বা গ্রাম এলাকায় পড়াশোনা করেছে তাদের সবাই নিজেদের পছন্দমতো ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের পথে অবাধে এগিয়ে যাবে এবং সঠিকভাবে উৎসাহিত করতে পারলে তারাও একদিন কর্মক্ষেত্রে উচ্চস্থানে পৌঁছতে পারবে। এসব কথা মনে রেখেই আমি দেশের বিভিন্ন স্থানে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, তাদের অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নাবলীতে আপ্লুত হয়েছি এবং পাশাপাশি তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেবার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছি।❑

বিজ্ঞানে নেতৃত্ব : চাই সাবেক ধারণায় রদবদল

ড. বিক্রম অম্বালাল সারাভাই

কোনও দেশের উন্নয়ন নিঃসন্দেহে সেদেশের মানুষের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানগম্যি ও প্রয়োগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কখনো-সখনো যুক্তিতর্ক তোলা হয়েছে যে প্রযুক্তির প্রয়োগ একাই উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করতে পারে। বিমূর্ত বিবৃতি হিসেবে এটা অবশ্যই ষোল আনা সাচ্চা, কার্যত কিন্তু ব্যর্থ। দশকের পর দশক ধরে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তেল উত্তোলন করে চলা পশ্চিম এশীয় দেশগুলির উন্নয়নের হাল এবং সামাজিক কাঠামো তার জ্বলজ্যান্ত সাক্ষীসাবুদ। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, প্রযুক্তির সত্যিকারের সামাজিক এবং অর্থনীতিক সুফল তাদের কাছে পৌঁছয় যারা তা বুঝে-শুনে প্রয়োগ করে। তাই প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশের বেশ কিছু মানুষের আধুনিক বিজ্ঞানের ধরনধারণ এবং তার থেকে উদ্ভূত প্রযুক্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখলে, প্রচলিত ধারণার বিষয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা বাড়ে। তা সে জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, পরমাণু বা মহাকাশ গবেষণা, বিজ্ঞানের যেকোনও শাখাতেই হোক না কেন। লাগে তাক না লাগে তুক, এই সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি নয়, চলে আসা ধারণার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতাই জগতের নিত্যদিনকার সমস্যা মোকাবিলায় সবচেয়ে

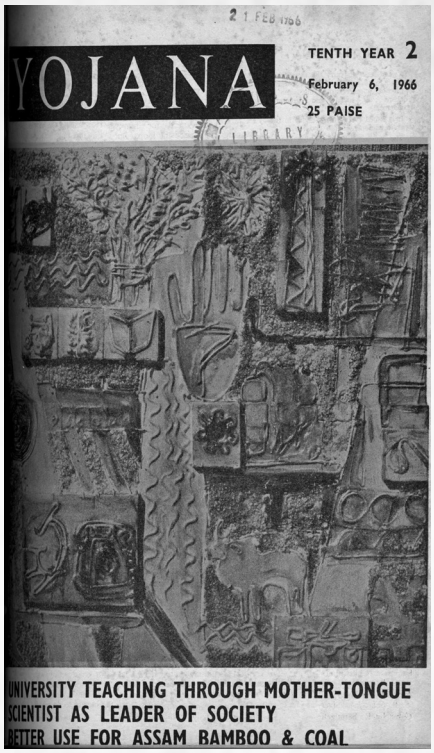

মোক্ষম উপায় বলে প্রমাণিত। তাই সেরা মানের গবেষণা করতে প্রতিটি দেশকে নিজের সম্বলসাধ্য সুযোগসুবিধের ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণা করতে সক্ষম বিজ্ঞানী বানানোটাই শেষ কথা নয়, দেশের বাস্তব সমস্যা ঘোচানোর জন্য কর্মমুখী প্রকল্প চালানোও সমান দরকারি।

আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তনের এক অনিবার্য ফল হল বর্তমানকার মূল্যবোধের ক্রমশ অবক্ষয়, প্রকৃতির বেবাক উপাদানের মধ্যে মানুষ কেবল একটি, এ মতবাদের বদলে মানুষকেন্দ্রিক বিশ্বের দিকে ভেসে যাওয়া। ধর্ম এবং বিশ্বাস থেকে জাত নৈতিক নিয়মাবলীর জায়গা কে নিতে পারে? আপনারা চমকে যেতে পারেন যে আমি বিশ্বাসে আস্থা রাখি। আমার উপলব্ধি, কোনও মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটাতে পারে না। তার প্রায় প্রতিটি কাজ, চালচলন বাইরের জগতকে প্রভাবিত করে এবং তাকে সচেতন থাকতে হবে বহির্জগৎ কিভাবে তার কাজকর্মে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে সেবিষয়ে। অন্যভাবে বললে, মায় ছোটোখাটো কাজে লেগে পড়ার আগেও সেকাজের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে তার আস্থা এবং বিশ্বাস থাকা চাই। রাস্তা পেরোতে গেলে সে মানুষটিকে অবশ্য বিশ্বাস রাখতে হবে, পথে চলা গাড়ির চালক সড়কপথের নিয়মকানুন জানে।

আমার মনে হয়, ব্যক্তি যে ভৌত এবং সামাজিক পরিবেশে বাস করে তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা আহরণ সব মানুষের কাছে সবচেয়ে জরুরি কাজ। এব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার কালে, পরিবেশ নিয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব সব সময় এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজ্ঞ ব্যক্তি কুসংস্কারের কবলে পড়ে ধর্ম থেকে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়, তেমনই বিজ্ঞান-আনাড়িদের মনকে পক্ষপাত এবং অসীম ক্ষমতার ধারণা আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তারা প্রযুক্তির প্রযোগ থেকে মেলা অঢেল সুফল উপভোগ করে। চটক ভোজবাজির জায়গা নিলে, সার্বিক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার জ্ঞানালোকে

[পুনঃমুদ্রিত নিবন্ধটি যোজনা পত্রিকার ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। লেখককে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কর্মসূচির জনক অভিধায় ভূষিত করা হয়। তিনি আনবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা-সহ দশটিরও বেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।]

আমরা তেমন কোনও বদল আনতে পারি না। অন্যদিকে, আজ, জ্ঞানের মান বাড়াতে ব্যর্থতার পরিণাম আগেকার যেকোনও সময়ের তুলনায় বিশ্ব নিরাপত্তার পক্ষে ঢের গুরুতর। বিজ্ঞানের বিষয়ে বুঝদারি বাড়ানোটা অবশ্যই শিক্ষার মূল সমস্যা এবং জনসংখ্যা ফুলেফেঁপে ওঠার পটভূমিকায় এই সমস্যা আরও ঘোরতর হয়ে উঠছে। নিছক প্রযুক্তি অর্জনের সুবাদে বিজ্ঞানের সমঝদার হওয়া যায় না। কোনও সমাজ এই সমস্যা ঠিকঠাক সামলাতে পারেনি, এই সখেদ সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

হিন্দু ধর্মে আছে দর্শনের অন্তঃপ্রবাহ, যা কিনা আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এই দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সামাজিক ঐতিহ্য মারফত তা অজান্তেই তারা আত্মস্থ করে। আমরা স্বীকার করি যে, উপলব্ধির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বাইরের বস্তু এবং পর্যবেক্ষকও। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আত্মগত বৈশিষ্ট্যকে আমরা তারিফ করি, মর্যাদা দিই। আমরা স্বীকার করি যে অজ্ঞতা, গোঁড়ামি এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানালোকে পৌঁছনোর হাজারো পথ আছে। উপনিষদ বোদ্ধা বা আপেক্ষিকতাবাদের অনুগামীদের নীতিবোধে চরম সত্য এবং মিথ্যা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

আমি যখন বিজ্ঞানীদের বিষয়ে এই সুরে কথা বলি, সম্ভবত এটা উল্লেখ করা দরকার যে আমি বিজ্ঞানে নিছক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পাওয়া ব্যক্তিকে আর একজন, যার বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা তার ব্যক্তিগত মূল্যাবোধে ফুটে ওঠে তার সঙ্গে পার্থক্য করছি বা এক পংক্তিতে বসাচ্ছি না। আমি মনে করি, এই আলোচনা শুধুমাত্র শেষের মানুষটির ক্ষেত্রেই অর্থপূর্ণ।

বিজ্ঞান ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব

আমি বিজ্ঞান এবং মানুষের নীতিবোধের বিষয়ে আমার বক্তব্য খাড়া করতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি। এটি আধুনিক যুদ্ধে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির তাৎপর্য এবং তা কিভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্বকে প্রভাবিত করে তার সঙ্গে সম্পর্কিত। আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ৬-৮ হজার কিলোমিটার দূরে বসে হাইড্রোজেন বোমা নির্দিষ্ট নিশানার মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে ছুঁড়তে পারার ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে এধরনের মারণাস্ত্রের অধিকারী দুই শত্রুপক্ষের কাছে বিবাদ ফয়সালার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের পথে পা বাড়ানোর ভাবনাচিন্তা এক ঘোরতর সমস্যা। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহাবস্থান, বৌদ্ধধর্ম থেকে এশীয়দের গৃহীত ''পঞ্চশীল''-এর একটি অঙ্গ হলে, তার পক্ষে সওয়াল করেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভও। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যেকার ভয়ভীতির ভারসাম্যের পরিণতির মূল্যায়ন করে তিনি একাজে নেমেছিলেন।

সব সময়েই সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে প্রযুক্তি উন্নয়নের সম্পর্ক আছে এবং প্রতিটি যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধাবিঘ্ন পরিবর্তনের ভাগীদারদের কাঁধে চেপে বসে। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি তার যেখানে খুশি সেখানে ঢিল ছোঁড়ার অধিকার স্বেচ্ছায় বর্জন করে। একাজ কিন্তু তিনি করে ফেলতে পারেন অনায়াসে। ঠিক তেমনই, পরমাণু যুগে, দেশগুলি স্বেচ্ছা-শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য। ব্যাপক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তির স্বাধীনতা এখানে আর অর্থবহ নয়।

কিন্তু দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ থাকলে কিভাবে তা ফয়সালা করা হবে? আলোচনার পথ ধরতে হবে,কিংবা দরকার হলে, তৃতীয় পক্ষ মারফত সালিসির কথা ভাবা যায়। এছাড়া, আমাদের সামনে খোলা আছে বাইরের ট্রাইব্যুনালের দরজাও। রাষ্ট্রসংঘের সনদে উল্লিখিত যৌথ নিরাপত্তা এহেন চিন্তাভাবনার স্বীকৃতি পাওয়ারই দ্যোতক। বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটির গঠনকারী দেশগুলির নেতারা বুঝেছিলেন সার্বভৌম রাষ্ট্র এখন আর কী করতে না পারে। বহু কিছুর মতো, এসব সংস্থানও অবশ্য কখনও ঠিকঠাক কার্যকর হয়নি। সব দেশের আমজনতা যদি সে যে পরিবেশে বাস করছে তার বাধ্যবাধকতা বোঝে তাহলে বিশ্বের নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার বিবাদবিসংবাদের রাজনৈতিক সমাধানের কাজে তা সাহায্য করবে অনেকখানি। বিশ্বের পরিস্থিতি এদিক থেকে হতাশাকর হলেও, সীমান্ত সমস্যা সমাধানে আমাদের সরকারের সাম্প্রতিক চুক্তি বিশ্ব শান্তির পক্ষে খুবই ইতিবাচক অবদান। এব্যাপারে কোনও কোনও মহল খোঁচা দিতে না ছাড়লেও, আমরা দেখেছি পঞ্চশীলে আস্থা হারানো এক সমাজের সংকট এবং তারা এখনও আধুনিক বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত আচরণবিধি গ্রহণ করেনি।

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখলে, প্রচলিত ধারণার বিষয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা বাড়ে। তা সে জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, পরমাণু বা মহাকাশ গবেষণা, বিজ্ঞানের যেকোনও শাখাতেই হোক না কেন। লাগে তাক না লাগে তুক, এই সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি নয়, চলে আসা ধারণার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতাই জগতের নিত্যদিনকার সমস্যা মোকাবিলায় সবচেয়ে মোক্ষম উপায় বলে প্রমাণিত।

খুব সম্ভবত, এতক্ষণে আপনারা বুঝে গেছেন আমি ধানাইপানাই করছি, বিজ্ঞানে নেতৃত্বের বিষয়ে আমার মুখে কুলুপ। আপনারা একদম ঠিক; তবে একটু মোলায়েম করেই বলি, প্রসঙ্গটিতে আসার আগে বিজ্ঞানের গুরুত্ব নিয়ে এই মোটামুটি দীর্ঘ প্রস্তাবনা বা মুখপাতের দরকার ছিল বইকি! আমার মতে, বিজ্ঞানে নেতৃত্বের করণীয় হবে : এক, সৃজনশীলতা এবং সমস্যার গভীরে ঢোকার আগ্রহে মদত জোগানো, লাগে তাক না লাগে তুক এই দৃষ্টিভঙ্গি আপাতত চিলেকোঠায় তুলে রাখা। দুই, তার পরিবেশের চাপিয়ে দেওয়া বাধাবিঘ্নের বোঝার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিবোধ এবং আচরণবিধির বিকাশ-বিবর্তন করা এবং যার সামনে দাঁড়িয়ে সে কাজ করছে তার পটভূমি বুঝতে পারার জন্য মানুষকে বেশি মাত্রায় অধিকতর সুযোগ দিতে হবে। তিন, সমাজের বিভিন্ন ব্যবহারিক বা ফলিত কাজ (Practical tasks), অর্থনীতি গড়ে তোলা, বাঞ্ছিত এক সামাজিক পরিমণ্ডল গঠন এবং জাতীয় নীতি, নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার মতো সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানীদের কাজে লাগানো।

সৃষ্টিশীল, শৃঙ্খলাপরায়ণ, মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরতে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব আমাদের জানাবোঝা আর পাঁচ-দশটা নেতাগিরির মতো নয়। এখানে নেই কোনও অধিনায়ক, না আছে তার সাগরেদ দল। নেতা বলে কাউকে চিহ্নিত করতে হলে, থোড়-বড়ি-খাড়া সৃষ্টিকর্তা নয়, তাকে হতে হবে উৎকর্ষের প্রয়াসে নিবেদিতপ্রাণ। প্রতিভার চারাগাছ যাতে ডালপালা মেলতে পারে তার জন্য তাকে উপযুক্ত পটভূমি এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাতাবরণ গড়ে তুলতে হবে। অন্যদের কাছে ফরমান জারির মাধ্যমে নিজেকে নেতা রূপে জাহির করার কোনও দরকার নেই। তাকে এর ঊর্ধ্বে ওঠার মতো উদার মানুষ হতে হবে। তিনি নিজের সৃজনশীলতা, প্রকৃতিপ্রেম এবং 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'-র প্রতি নিষ্ঠার মারফত এক নজির স্থাপন করবেন। শিক্ষা এবং গবেষণা প্রাঙ্গণে আমাদের চাই এধরনের নেতা। এরাই শিক্ষার পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সংক্রান্ত ধরাবাঁধা গতকে বার বার চ্যালেঞ্জ জানান, ধারণার আত্মগত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে অভিজ্ঞতা জোগানোর কাজে নিজেকে জড়িত রাখেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তিমানুষ মূল্যবোধ এবং উল্লেখ-কাঠামো গড়ে তোলে।

বাস্তব সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ

দেশ গঠনের কাজে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর কথা প্রসঙ্গে, ফের বলতে হয় যে কর্তৃত্ব ফলানো ওপরওলা নয়, হাতে হাত মিলিয়ে চলার নেতাই সবচেয়ে কাজের। তিনি নিজেকে অন্যদের কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখবেন, পরামর্শ দেবেন এবং নেবেনও। আমাদের সমাজে কাজে লাগার ফল সম্পাদনে, বিজ্ঞানীদের আজব হ্যাপার মুখে পড়তে হয়। আমরা বৌদ্ধিক প্রচেষ্টাকে সমাজে খুব তোল্লা দিই বটে কিন্তু ধারণা করি যে, যারা এসবে ব্যাপৃত তারা অবিশ্বস্ত। আমরা জাতীয় গবেষণাগারে গবেষক বিজ্ঞানী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষকদের নিন্দামন্দ করি যদি তারা বাইরে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরামর্শ দিয়ে বা কোনও প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে কিছু বাড়তি রোজগারের পথ বেছে নেন। জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন একান্ত বাস, অর্থাৎ গজদন্তমিনারকে আমরা প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিই। আগেই বলেছি, আমি বিশ্বাস করি, যারা মৌলিক প্রশ্ন তোলে তারাই ব্যবহারিক বা ফলিত কাজে তুখোড় হতে পারে। কেননা, অধিকাংশ বিষয়ে আদত সমস্যার তত্ত্বতালাশ তার সমাধানের পথ অনেকটা এগিয়ে দেয়।

সমাজের সমস্যা মেটাতে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের কাজে লাগানোর অবস্থা তৈরি করার জন্য, আমাদের উচিত বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেওয়া, যাতে তারা তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্র বহির্ভূত সমস্যাতেও আগ্রহ দেখান।

সমাজের সমস্যা মেটাতে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের কাজে লাগানোর অবস্থা তৈরি করার জন্য, আমাদের উচিত বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেওয়া, যাতে তারা তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্র বহির্ভূত সমস্যাতেও আগ্রহ দেখান। একথা অবশ্য ঠিক, তার নিজস্ব ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে বিজ্ঞানীর মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়াটা কেউ আশা করে না। কিন্তু বিজ্ঞানের পথ আত্মস্থ করা ব্যক্তি যেকোনও ঘটনা-সংস্থানে নতুনভাবে দেখার বীজ বুনতে পারেন, সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞানালোকের প্রবেশ আশা করা যেতেই পারে এবং এভাবে তিনি যে নেতৃত্ব দেন তা খুব মূল্যবান বই কি!

আমি নানা রকম কমিটিতে বিজ্ঞানীদের ঢোকানোর পক্ষে সওয়াল করছি না। এতো আমাদের প্রচুর আছে। আমি অবশ্যই বলছি, নির্দিষ্ট কাজ করা অথবা তাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও তাদের নিজের বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। অসংখ্য বিষয়ে প্রতিটি মানুষের দোড়গোড়ায় এটা সম্ভব। শিক্ষা পদ্ধতি এবং পাঠক্রমের উন্নতি, স্থানীয় শিল্প গড়া কিংবা খামারের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, স্থানিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বানানো, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এটা আসতে পারে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমেদাবাদে দু' বছর আগে গড়া হয়েছিল বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির জন্য এক গোষ্ঠী। গোষ্ঠীটিতে ছিলেন স্কুল, কলেজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং এমন প্রতিষ্ঠানের কিছু কৃতী পড়ুয়া। বিজ্ঞান জানাবোঝা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য দৃঢ় ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণাই তাদের এক সুতোয় বেঁধেছিল। প্রশ্ন তুলতে, উদ্ভাবনে এবং অভিজ্ঞতা লেনদেন করতে তারা সদাপ্রস্তুত। প্রতিটি স্তরে, যেখানেই তারা কাজ করুন না কেন, আমরা এখানে যা চিন্তাভাবনা করছি তারা সে ধরনের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতে কাজ চালানোর সুযোগসুবিধে বেশ কিছু দেশের ধারে-কাছে আসে না। চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে আমরা কেউ কেউ হতাশ হয়ে পড়ি। অনেকে দেশ ছাড়েন। কিন্তু সমাজ এবং দেশের সমস্যাদির দিকে যারা অন্তর্দৃষ্টি দেন তারা কাজকর্মের এক উদ্রেকজনক ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। ধীরে ধীরে হলেও, সেখানে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেওয়া ফলে।

এধরনের নেতৃত্বের জন্য সুযোগসুবিধের বন্দোবস্তে আমাদের কী করণীয়? চটজলদি পরিবর্তনের জন্য বাস্তব জগৎ থেকে বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার দৃষ্টিভঙ্গি আমি আশা করিনে। আমার বিশ্বাস হয় না, অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদদের জন্য প্রশাসকদের সমতুল সুযোগ দিতে পারব। কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখি, হয়তো বা দিবাস্বপ্ন যে তাদের নিজের কাজ চালানোর পাশাপশি যারা আসল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমরা তাদের উৎসাহ জোগাতে পারি। তা সে কাজ ছোটো-বড়ো যাই হোক না কেন। এছাড়াও, আমার স্বপ্ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এধরনের কাজের লক্ষ্য অর্জন করা গেলে আর্থিক পুরস্কার মেলা উচিত, এই তত্ত্ব বা ধারণার স্বীকৃতি আমরা আদায় করতে পারব। তাহলে সার্বিক পরিস্থিতির, নিদেন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে উন্নতি হবে। বিকাশের এক নতুন আবহ থেকে তখন বিজ্ঞানে নেতৃত্বে উঠে আসতে পারে।❑

কৃত্রিম মেধা : ভারতে এর সুবিধা ও অসুবিধা

যোগেশ কে. দ্বিবেদী
সন্তোষ কে. মিশ্র
লরি হিউস

সম্প্রতি AI ক্ষেত্রে যে বিকাশ ঘটছে তাতে শিল্পে, সরকারি সংস্থায় তথা সমাজে তা প্রয়োগের নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তবে বিভিন্ন কাজে AI ব্যবহারের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা তৈরি হচ্ছে তার অবশ্য অনেক বিপদও রয়েছে। দেশে AI ব্যবহারের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই নিবন্ধে। সেইসঙ্গে, সরকারের যে নীতিগুলি পরবর্তীকালে AI-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রসারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে তার ওপরও এই নিবন্ধে আমরা আলোকপাত করব।

কোনও সমস্যা সমাধানে সাধারণভাবে মানুষ যে ভূমিকা পালন করে থাকে কোনও সিস্টেম যদি সফটওয়্যার/অ্যালগরিদম বা যন্ত্র/সরঞ্জামের মাধ্যমে বাইরের ডেটাকে চিনে ও ব্যাখ্যা করে তা পালন করতে পারে তবে সেই ব্যবস্থাকেই বলা হয় কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।[১], [২] আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI-কে আরও বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, যেমন এক্সপার্ট সিস্টেমস, ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম, নলেজ-বেসড সিস্টেম, মেশিন লার্নিং, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, নিউট্রাল নেটওয়ার্ক, প্যাটার্ন রিকগনিশন, রেকমেন্ডার সিস্টেমস এবং টেক্সট লার্নিং।[১], [৩]

১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকেই AI শব্দটির জন্ম। তবে সাম্প্রতিককালে তথ্যপ্রযুক্তি (যেমন, বিগ ডেটা, ইমপ্রুভড কম্পিউটিং, স্টোরেজ ক্যাপাবিলিটি এবং অত্যন্ত দ্রুত গতির ডেটা প্রসেসিং মেশিন) ও রোবোটিক্সের রমরমার যুগে AI বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিতে এর প্রয়োগ ও ব্যবহার প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে।[১], [৩]

সম্প্রতি AI ক্ষেত্রে যে বিকাশ ঘটছে তাতে শিল্পে, সরকারি সংস্থায় তথা সমাজে তা প্রয়োগের নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তবে বিভিন্ন কাজে AI ব্যবহারের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা তৈরি হচ্ছে তার অবশ্য অনেক বিপদও রয়েছে। দেশে AI ব্যবহারের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই নিবন্ধে। সেইসঙ্গে, সরকারের যে নীতিগুলি পরবর্তীকালে AI-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রসারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে তার ওপরও এই নিবন্ধে আমরা আলোকপাত করব।

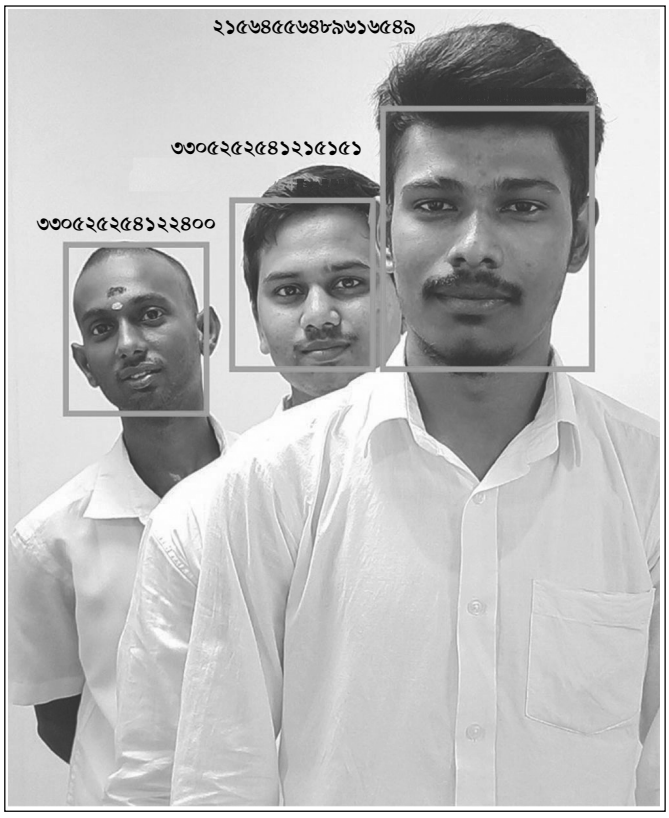

সুযোগ ও প্রয়োগ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেসমস্ত কাজে স্ট্রাকচারড ডিসিশনের (অর্থাৎ, যেসমস্ত ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং তা নিয়ে কোনও অনিশ্চয়তা থাকে না) প্রয়োজন সেখানে AI-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।[৩]

[লেখক (১) অধ্যাপক, ডিজিট্যাল বিপণন ও উদ্ভাবন এবং কো-ডিরেক্টর, স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য ই-মেল : y.k.dwivedi@swansea.ac.uk; (২) IAS এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, তামিলনাড়ু ই-প্রশাসন এজেন্সি, তামিলনাড়ু সরকার। ই-মেল : misrask@gov.in; এবং (৩) লেকচারার, স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য। ই-মেল : d.l.hughes@swansea.ac.uk]

একেবারে গণনা-নির্ভর ক্ষেত্র (কম্পিউটেশনালি ইনটেনসিভ) বা যেসমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা সীমাবদ্ধ সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে। উৎপাদন, আইন, আর্থিক বিষয়, ওষুধপত্র, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, সরকার, কৃষি, বিপণন, পরিচালনা, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, সরকারি পরিষেবা বিতরণ ও সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে AI প্রয়োগের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে।[১]

শিক্ষাক্ষেত্রে AI প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা যেমন বাড়ানো যেতে পারে তেমনই ইন্টেলিজেন্ট গেম ভিত্তিক পঠনপাঠন, টিউটরিং সিস্টেম এবং ইন্টেলিজেন্ট ন্যারেটিভ প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরও পঠনপাঠনে আরও আগ্রহী করে তোলা যায়।[৪] Schmelzer[৫]-এর মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে AI-এর তিন রকম প্রভাব পড়তে পারে। প্রথমত, AI-চালিত হাইপার-পার্সোনালাইজেশনের (ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট পণ্য ও পরিষেবার ব্যবস্থা) সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, পছন্দ-অপছন্দ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজন ও ঝোঁক অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট (যেমন, আমাজন আলেক্সা, গুগল হোম, অ্যাপল সিরি এবং মাইক্রোসফট কর্টানা) ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। নিজেদের ক্যাম্পাস, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে এখন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করছে। তৃতীয়ত, ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া ও গ্রেডিং, তাদের আলাদা আলাদা প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তর দেওয়া, বার বার করতে হয় এমন রুটিন কাজ বা লজিস্টিকস সংক্রান্ত কাজে শিক্ষকদেরও অনেক সাহায্য করতে পারে AI-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা।[৫] বিভিন্ন শাখায় গবেষণার কাজে AI-ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রভূত সাহায্য করতে পারে। সেইসঙ্গে, গ্রন্থাগারের কাজের পদ্ধতিকে আমূল বদলে দেওয়ার পাশাপাশি কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থার চেনা-পরিচিত ছকটাই বদলে দিতে পারে এই AI-ভিত্তিক প্রযুক্তি। এতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা।[১]

বিভিন্ন ক্ষেত্রের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যও AI-ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। দ্বিবেদী ও অন্যান্যদের[১] মতে, রাষ্ট্রসংঘের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা SDG পূরণেও AI-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশেষ করে যেসমস্ত উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সীমিত সেখানে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্য অনেকখানি পূরণ করা যেতে পারে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক দূরে বসে থাকা কোনও রুগির রোগ নির্ণয় করা যেতে পারে। এতে চিকিৎসকদের কাজও অনেক সহজ হয়। SDG-2 অর্থাৎ 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মোচনের' (জিরো পভার্টি অ্যান্ড জিরো হাঙ্গার) লক্ষ্যপূরণেও সহায়ক হতে পারে AI-ভিত্তিক প্রযুক্তি। সময়মতো প্রতিকূল আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিয়ে, ফসলের বিভিন্ন রোগব্যাধি নির্ণয় এবং ফসল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ চিহ্নিত করে কৃষিক্ষেত্রে বড়োসড়ো বিপর্যয়ের ঝুঁকি এড়াতেও সাহায্য করে AI-ভিত্তিক প্রযুক্তি। এছাড়া, 'পরিস্রুত জল, অনাময়' এবং 'সুলভ দূষণহীন প্রযুক্তি' সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) পূরণেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভারতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ

ভারতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি ক্ষেত্রের বিভিন্ন সূচকই বলে দেয় যে এখানে AI-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কতটা। এখানে প্রতি হাজার চিকিৎসক-রুগির অনুপাত হল ০.৮, অর্থাৎ প্রতি হাজার রুগির জন্য চিকিৎসক রয়েছেন ০.৮ জন (ব্রিটেনে ২.৮, অস্ট্রেলিয়ায় ৫, চিনে প্রায় ৫)। এখানে প্রতি রুগির জন্য চিকিৎসকরা মাত্র দু' মিনিট করে সময় দিতে পারে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি রুগিকে কুড়ি মিনিট করে সময় দেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের কাজের চাপ কমানো তথা রোগ নির্ণয়ে তাদের সাহায্য করতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে AI। AI-চালিত রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। চিন ও ব্রিটেনের তুলনায় ভারতে হেক্টরপিছু দানাশস্যের ফলন প্রায় অর্ধেক (চিন ও ব্রিটেনে হেক্টরপিছু ফলন যেখানে ৬ হাজার কেজি, সেখানে ভারতে হেক্টরপিছু ফলন ৩০০০ কেজি)। কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধির কারণে প্রচুর ফলন মার খায় এখানে। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির তুলনায় প্রতি হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন প্রায় ৫০ শতাংশ কম (ভারতে প্রতি হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ২.৪ জন এবং ব্রিটেনে এই সংখ্যাটা ৬.৩)। তবে এই অন্ধকারের মধ্যেও একটা আলোর রেখা রয়েছে। ভারতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন ১১৮ কোটি মানুষ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬০ কোটি। ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের হাতে রয়েছে স্মার্ট ফোন। গোটা বিশ্বের তুলনায় এখানে ডেটা ব্যবহারের খরচ অত্যন্ত কম। আর এখানে গড় ডেটা স্পিড হল ৬ Mbps। ফলে AI প্রযুক্তি কাজে লাগানোর বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে এখানে।

আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তামিল ভাষায় 'অনিল' নামক একটি স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট চালু করেছে তামিলনাড়ুর বৈদ্যুতিন প্রশাসন সংস্থা। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্য কীভাবে আবেদন করতে হবে, ধাপে ধাপে তা বলে দেয়

NLP-ভিত্তিক এই স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। সরকারি পরিষেবা বিতরণে AI-ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তামিলনাড়ু সরকার। তামিলনাড়ুর বৈদ্যুতিন প্রশাসন সংস্থা সম্প্রতি ফসল বিনষ্টকারী বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও ফসলের বিভিন্ন রোগব্যাধি চিহ্নিত করার জন্য একটি AI-ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করেছে এবং একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের কাছে এই ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দিয়েছে। রোগগ্রস্ত ফসল বা কীটপতঙ্গের ছবি তুলতে হয় সংশ্লিষ্ট কৃষককে। তারপর সিস্টেমে ওই ছবিটির বিশ্লেষণ চলে। AI অ্যালগরিদমের সাহায্যে ফসলের রোগ বা কীটপতঙ্গকে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কৃষকের কাছে বার্তা পাঠানো হয়। কীভাবে এই সমস্যার প্রতিকার করা যায় তার উল্লেখ থাকে এই বার্তায়। এই ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৪০০ কৃষক এই অ্যাপের সাহায্যে ফসলের রোগ বা কীটপতঙ্গ শনাক্তকরণের অনুরোধ জানাচ্ছেন এবং তারা তাদের প্রশ্নের জবাবও পাচ্ছেন। AI প্রযুক্তির সাহায্যে ফেস রিকগনিশন বা মুখমণ্ডল চিহ্নিত করে হাজিরা নথিভুক্তির এক অভিনব ব্যবস্থা চালু করেছে তামিলনাড়ু সরকার। এতে প্রতিদিন দৈনিক ৪৫ মিনিটেরও বেশি সময় বাঁচছে। ফলে পঠনপাঠনের কাজে অতিরিক্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। রেডিওগ্রাফি-ভিত্তিক রোগ শনাক্তকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন, শরীরের ভেতরে রক্তক্ষরণ চিহ্নিত করতে সিটি স্ক্যান ইত্যাদিতে AI প্রযুক্তির সাহায্য নিলে চিকিৎসকদের কাজের বোঝা অনেক লাঘব হবে এবং দূরদূরান্তে বসে থাকা রুগিদেরও চিকিৎসা করতে পারবেন তারা।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সফলভাবে AI প্রযুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন :

● ***ব্যাখ্যা করার অসুবিধে :*** AI প্রযুক্তি ব্ল্যাক বক্স সিস্টেমে কাজ করে, অর্থাৎ যেখানে সিস্টেমের প্রোগ্রামিং বা ভেতরের কলকব্জা সম্বন্ধে না জেনেই শুধু তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। ফলে কোনও একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত, শ্রেণিবিন্যাস বা পূর্ভাভাসের পেছনে কী যুক্তি রয়েছে তা সব সময় ব্যাখ্যা করা যায় না।[১] ফলে এই ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে একটা প্রশ্ন রয়েই যায়। আর সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হবে কিনা তা নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

● ***পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে ধারণার অভাব ও নতুন কিছু শেখার অক্ষমতা :*** একটা বেঁধে দেওয়া ছকে কাজ করার ক্ষেত্রে AI প্রযুক্তির কোনও তুলনা নেই। কিন্তু যে কাজের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক

সম্বন্ধে জানতে হয় সেক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই প্রযুক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে কোনও শিক্ষা নিতে পারে না, যেটা মানুষ পারে। তাই বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করায় সমস্যা আছে।

● ***কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই :*** AI-ভিত্তিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি/কারিগরি ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও পরিষেবায় এই প্রযুক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে (যেমন, স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, বিভিন্ন পণ্যের মডিউল, ক্লাউড লাইব্রেরি, ডেটা সায়েন্স চালিত বিভিন্ন ব্যবস্থা)। বিভিন্ন ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নিয়ম আছে (সেইসঙ্গে বিভিন্ন ডেটার মধ্যে গুণমানের ফারাকও রয়েছে)। এখন, এই বিভিন্ন ধরনের ডেটার ওপর ভিত্তি করে বানানো AI ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কীভাবে সমন্বয়সাধন করা হবে সেটা একটা বড়ো প্রশ্ন। তারপর, AI-ভিত্তিক প্রযুক্তি ও কর্মীদের পাশাপাশি রেখে কীভাবে সফলভাবে কোনও কার্যসাধন করা যাবে তা নিয়েও সংস্থাগুলি ধোঁয়াশায়।[১], [৬]

● ***কর্মী ছাঁটাই :*** স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রয়োগ যত বাড়বে তত বেশি করে কাজ হারাবেন কর্মীরা। বিশেষ করে অদক্ষ শ্রমিকরা। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রেও চাকরির সুযোগ কমবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে, কারণ ওই দেশগুলিতে এমনিতেই কাজের সুযোগ সীমিত। তাই AI-ভিত্তিক প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের আগে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে কয়েকটি মূল প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। যেমন, কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হবে, ওই ধরনের কাজগুলির কতটা অংশ স্বয়ংক্রিয় হবে, মানুষের কাজের ওপর AI-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার কতখানি প্রভাব পড়বে বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ভুলচুক হলে তা কীভাবে সংশোধন করা হবে, এই বিষয়গুলি নিয়ে সবার আগে বিচারবিবেচনা করতে হবে।[১]

● ***দক্ষতার অভাব ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা :*** AI-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তৈরি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অনেক সংস্থারই কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আর এই ব্যবস্থা কাজে লাগানোর মতো দক্ষতাও থাকে না কর্মীদের। এক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠানই বাইরের

কোনও কনসালটেন্সি সংস্থার সাহায্য নিয়ে থাকে। কিন্তু একাজে খরচ প্রচুর। তাই যেসমস্ত সংস্থার অর্থবল সীমিত তারা এই প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারে না। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সংস্থাগুলির চাই দক্ষ কর্মী। কর্মীদের এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলাটা সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা উভয়ের কাছেই একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। আর এই প্রযুক্তির ব্যবহার শেখাটাও কর্মীদের কাছে চ্যালেঞ্জ।

● ***আস্থার অভাব ও পরিবর্তনের বিরোধিতা :*** এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। তার ওপর রয়েছে সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচার। এতে সাধারণ মানুষের মনে একটা ভীতি তৈরি হয়। তাই AI-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মী বা অংশীদারদের বিরোধিতার মোকাবিলা করে তাদের মনে আস্থা গড়ে তোলাটাও একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজন্সের এই সদা পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় সরকারি নীতি ঘিরেও অনেক সময় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। AI প্রযুক্তির প্রভাব এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে যে এর প্রভাব নির্ধারণ করা মুশকিল হয়ে পড়ছে। সেইসঙ্গে কোথায় এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর লাগাম টানা হবে তাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। AI প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির ওপর যে ছয়টি চ্যালেঞ্জ আসতে পারে তা আমরা চিহ্নিত করেছি।

নীতি

যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী নীতি মেনে চলা হবে তা গবেষকদের কাছে গভীর বিবেচনার বিষয়। তবে এই বিষয়টির একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া খুব মুশকিল। তাই সম্পূর্ণভাবে AI-এর দৃষ্টিকোণ থেকে ছয়টি নীতির কথা উল্লেখ করছি। AI ব্যবহার সংক্রান্ত নীতির প্রধানত দু'টি দিক রয়েছে। যথা, (ক) গোপনীয়তা ও তথ্যের সুরক্ষা, (খ) মানবিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত মূল্যবোধ।

(ক) **গোপনীয়তা ও তথ্যের সুরক্ষা :** AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবার আগে গোপনীয়তার প্রশ্নটি চলে আসে। ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিশদ তথ্য (গ্র্যানিউলার ডেটা) সঞ্চিত থাকে AI নেটওয়ার্কে (যেমন, মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ এবং সিসিটিভি ফিডের মাধ্যমে কোনও একটি বিশেষ দিনে একজন ব্যক্তির অবস্থান, খাদ্যাভ্যাস, কেনাকাটার ক্ষেত্রে পছন্দ-অপছন্দ, পছন্দের সিনেমা, গান ইত্যাদি তথ্য)।

(খ) **মানবিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত মূল্যবোধ :** AI-ভিত্তিক যেকোনও ব্যবস্থাকেই মানবিক মূল্যবোধগুলি মেনে চলতে হবে। নীতি রচয়িতাদের কয়েকটি মূল প্রশ্ন মাথায় রাখতে হবে, যেমন, শ্রদ্ধা, সম্মান, দয়া, সহমর্মিতা বা সমতা, ইত্যাদি মানবিক গুণগুলি সম্বন্ধে AI-ভিত্তিক ব্যবস্থাকে কি সংবেদনশীল করে তোলা হয়েছে? শিশু, বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী মহিলা, অসুস্থ ব্যক্তি ও বিপন্ন মানুষজনকে যে অগ্রাধিকার দিতে হবে সে বিষয়ে সিস্টেম কি অবগত? AI-ভিত্তিক ব্যবস্থার কোনও সিদ্ধান্তের যে প্রভাব সমাজে পড়বে তার মূল্য যাতে এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও নিরীক্ষণ

আগামী দিনে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবহণ ও বয়স্কদের পরিচর্যার ক্ষেত্রে মানুষের পাশাপাশি কাজ করবে AI-ভিত্তিক ব্যবস্থা। এখানে গৃহীত সিদ্ধান্তের পেছনে কী যুক্তি রয়েছে ব্যবহারকারীদের কাছে তা ব্যাখ্যা করতে হবে প্রযুক্তি নির্মাতাদের। মামলামোকদ্দমার ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। শুধু মামলামোকদ্দমার প্রয়োজনে নয়, আমরা যাতে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেজন্যও AI সিস্টেমে একটা অডিট বা নিরীক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা দরকার।

তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্য ও তথ্যের ঘাটতি

AI প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব এসেছে সেখানে ডেটা রয়েছে একদম প্রাথমিক স্তরে। ফলে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক দেশ ও সমাজ পিছিয়ে পড়তে পারে। যেসমস্ত দেশ বা সরকারের কাছে উন্নত মানের ও বিশদ তথ্য (গ্র্যানিউলার ডেটা) রয়েছে তারা এই যুগান্তকারী প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে, যে দেশের হাতে উন্নত মানের ডেটা নেই সেগুলি তাদের নাগরিকদের উন্নতিকল্পে এই প্রযুক্তিকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারবেনা।

নিরপেক্ষতা ও সমতা

এই প্রযুক্তি সমাজের চিরাচরিত শ্রেণিবিন্যাস পালটে দিয়ে একটা নতুন সামাজিক কাটামো গড়ে তুলতে পারে। দরদারির এই কাঠামোয় যাদের অবস্থান একেবারে নিচে তাদের ওপর শোষণ চলবে। এই প্রযুক্তি মানুষের শ্রমকে নিছক একটা পণ্য করে তুলবে। মানুষের মর্যাদাও নষ্ট হবে। তাই AI ব্যবস্থাপনায় সমতার নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে এই দুনিয়ার আর কোনও মানুষ বৈষম্যের শিকার হবে না। স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থায় যাতে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। এই ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষের বৈষম্য থাকবে না বা কোনও জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্বও থাকবে না। এই ব্যবস্থায় যাতে 'সোশ্যাল প্রোফাইলিং' অর্থাৎ কম্পিউটারচালিত অ্যালগরিদম বা প্রযুক্তির সাহায্যে কোনও ব্যক্তির সামাজিক প্রোফাইল না তৈরি করা হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে; বিশেষ করে আইন প্রয়োগ, জালিয়াতি শনাক্তকরণ বা অপরাধ দমনের মতো ক্ষেত্রে।

দায়বদ্ধতা ও আইনি বিষয়

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ছাড়া মানুষের তৈরি যেকোনও ব্যবস্থাপনা নিছকই একটা যন্ত্র যার নিয়ন্ত্রণ অপারেটরের হাতে। তাই দায়বদ্ধতার প্রশ্ন এখানে আসে না। বিশ্বের সব দেশেরই দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধিতে যন্ত্রের অপারেটর, মালিক ও নির্মাতার ওপর দায়বদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। মামলার প্রকৃতি অনুযায়ী এই দায়বদ্ধতার কিছুটা তারতম্য হতে পারে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বলে বলীয়ান হয়ে যন্ত্র যখন নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে তখন কার ওপর দায়বদ্ধতা বর্তাবে সেটা একটা বড়ো প্রশ্ন। বিশেষ করে নির্মাতার কাছেও যখন এই যন্ত্রের

অ্যালগরিদম অজানা থাকে তখন দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

অপব্যবহার প্রতিরোধ

এই ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে এটিই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন। প্রতিটি নতুন প্রযুক্তির অপব্যবহার কীভাবে প্রতিরোধ করা যাবে? ইন্টারনেট আসার পরে বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু তার পাশাপাশি চলে এসেছে সাইবার অপরাধ, ম্যালওয়্যার, ভাইরাসের মতো বিপদ। বিভিন্ন হিংসাত্মক অনলাইন গেমের ফাঁদে পড়ে কত নিরপরাধ কিশোর-কিশোরীর প্রাণ যাচ্ছে। তাই স্বয়ংক্রিয় AI ব্যবস্থাপনা এমনভাবে তৈরি করতে হবে তার অপব্যবহারের সুযোগ না থাকে। এই বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করলে চলবে না।

পরিশেষে

ভারতের মতো যেসব দেশের হাতে সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার রয়েছে এবং সেইসঙ্গে নানা সমস্যা সমাধানের জন্য AI ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে যারা সক্ষম সেইসব দেশে এই প্রযুক্তির অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি ক্ষেত্রের নানান সমস্যার মোকাবিলার জন্য তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য ইতোমধ্যেই AI প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। সর্বস্তরে এই প্রযুক্তিকে ছড়িয়ে দিতে গেলে স্বচ্ছতা, নিরীক্ষণ, নিরপেক্ষতা, সমতা, দায়বদ্ধতা ও অপব্যবহার প্রতিরোধের মতো নীতিগত বিষয়গুলির ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই AI বিপ্লব যাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে পারে তার জন্য সরকারের একটা উপযুক্ত নীতিকাঠামো থাকা চাই।[১]❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., Misra, S. & Galanos, V. (2019). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management.* DoI : https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002

(২) Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15-25.

(৩) Duan, Y., Edwards, J. S., & Dwivedi, Y. K. (2019). Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data–evolution, challenges and research agenda. International Journal of Information Management, 48, 63-71.

(৪) Chaudhri, V. K., Lane, H. C., Gunning, D., & Roschelle, J. (2013). Applications of Artificial Intelligence to Contemporary and Emerging Educational Challenges. Artificial Intelligence Magazine, Intelligent Learning Technologies: Part, 2(34), 4.

(৫) Schmelzer, R. (2019). AI Applications in Education. Forbes. Available at https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/07/12/ai-applications-in-education/#5f93548f62a3

(৬) Walton, P. (2018). Artificial intelligence and the limitations of information. Information (Switzerland), 9(12) doi:10.3390/info9120332.

জানেন কি?

সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলের নবম শ্রেণিতে নয়া পাঠ্য বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী

পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বহুমুখী ভাবধারা আরও প্রসারিত করতে এবং নয়া প্রজন্মকে সচেতন করতে ২০১৯-'২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশান' (সিবিএসই)-স্বীকৃত বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নতুন বিষয় হিসেবে চালু করা হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-বিষয়ক 'Inspire' মডিউল

অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-বিষয়ক ১২ ঘণ্টার 'Inspire' মডিউল-এর কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। সিবিএসই-র ওয়েবসাইটে (http://cbseacademic.nic.in/ai.html) অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পড়ানোর জন্য পাঠ্যবস্তু পাওয়া যাচ্ছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্কুলের পড়াশুনার বিষয় হিসেবে চালু করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা পর্ষদকে। বেসরকারি স্কুল-সহ সিবিএসই একাধিক সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। সারা দেশজুড়ে বিভিন্ন সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে ৪০-টি কার্যক্রম আয়োজিত হয়েছে; সব মিলিয়ে এতে অংশ নিয়েছেন মোট ১৬৯০ জন প্রধানশিক্ষক ও শিক্ষক।

আশা করা হচ্ছে আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জীবনের সব ক্ষেত্রেকে প্রভাবিত করবে। কারণ, এটি এমন একটি বহুমুখী বিষয় যার সীমানা সর্বদিশায় সুদূর প্রসারিত। তাই, স্কুল চাইলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পঠনপাঠন শুরু করার সুযোগ পাচ্ছে সব ক'টি সিবিএসই স্কুল।

এই বিষয়টি বেছে নিতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে http://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2019/14_Circular_2019.pdf মারফত আবেদন করতে হবে।❑

সূত্র : পিআইবি, সিবিএসই

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্ভাবনায় গুরুত্ব

সত্যনারায়ণন শেষাদ্রি

উদ্ভাবন কেন্দ্রগুলি দলবদ্ধভাবে কাজ করতে উৎসাহ দেয় এবং শ্রেণিকক্ষের রুটিনবদ্ধ পড়াশোনার বাইরে নানান কর্মকাণ্ডেও সাহায্য করে। মাল্টিজেনারেশনাল পণ্য (সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে পণ্যকে আরও উন্নত করতে হয়) উৎপাদনের গবেষণার ক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে দায়িত্ব নিতেও উৎসাহ দেয় এই কেন্দ্রগুলি। এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ (IITM)। এখানে যে সেন্টার ফর ইনোভেশন (CFI) গড়ে তোলা হয়েছে তা পড়ুয়াদের নিষ্ক্রিয় শ্রোতা থেকে সক্রিয় জ্ঞানার্জনকারী করে তুলেছে। নতুন নতুন উদ্ভাবনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলাটা যে জ্ঞানার্জনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা আজ বড়ো বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। উদ্ভাবনার সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েই প্রতিষ্ঠানগুলির এই পরিবর্তন। সেই আমূল পরিবর্তনের কথাই তুলে ধরা হয়েছে এই নিবন্ধে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষার অগ্রণী প্রতিষ্ঠানগুলি বহু শিক্ষার্থীকেই সমৃদ্ধির পথ দেখিয়েছে। আগে এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে বেরোনোর পর পড়ুয়ারা মুখিয়ে থাকত পশ্চিমে প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু গত দশ বছরে ছবিটা বদলেছে। উচ্চশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানগুলি এখন পরবর্তী প্রজন্মের কর্ণধার তৈরিতে মনোনিবেশ করেছে যারা বিদেশে মোটা অঙ্কের চাকরির মোহ ত্যাগ করে দেশে নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসবেন, দেশে হাজার হাজার চাকরির সুযোগ তৈরি করবেন। উদ্ভাবনার সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েই প্রতিষ্ঠানগুলির এই পরিবর্তন।

উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহদান

ছোলেবেলায় আমরা সকলেই খেলাচ্ছলে অনেক জিনিস গড়েছি, অনেক ভেঙেছি। আমাদের সকলের মধ্যেই এক উদ্ভাবনী সত্তা রয়েছে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পড়াশোনার চাপে এই উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটে না। তা সুপ্ত রয়ে যায়। নতুন নতুন উদ্ভাবনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলাটা যে জ্ঞানার্জনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা আজ বড়ো বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। নীতি আয়োগের তত্ত্বাবধানে অটল ইনোভেশন মিশন (AIM) বিদ্যালয়গুলিতে অটল টিংকারিং ল্যাব (ATL) স্থাপনের মাধ্যমে উদ্ভাবনার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। অর্থাৎ, এই ল্যাবে উদ্ভাবন কৌশল শিখে নিজেদের ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ (IITM)। এখানে যে সেন্টার ফর ইনোভেশন (CFI) গড়ে তোলা হয়েছে তা পড়ুয়াদের নিষ্ক্রিয় শ্রোতা থেকে সক্রিয় জ্ঞানার্জনকারী করে তুলেছে। পরীক্ষার নম্বরের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে সেই জন্যই এই উদ্যোগ। ১৯৮১ সালের প্রাক্তনীদের দেওয়া অর্থে পড়ুয়াদের দ্বারা পরিচালিত এই টিংকারিং ল্যাব ও মেকার স্পেস (যেখানে একসঙ্গে অনেকে মিলে কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগ করে কোনও জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন) গড়ে তোলা হয়। যারা নিজেদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কোনওকিছু উদ্ভাবন করতে চান তাদের উৎসাহ ও সহায়তা জুগিয়ে চলেছে এই কেন্দ্র। প্রাক্তনীদের এই কেন্দ্রের মূল মন্ত্রই হল...'নিজেদের ভাবনা নিয়ে এসো, উদ্ভাবিত সামগ্রী নিয়ে যাও' (ওয়াক উইথ অ্যান আইডিয়া, ওয়াক আউট উইথ আ প্রোডাক্ট)। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অভিনব সব পণ্য সামগ্রী তৈরি হয়ে চলেছে এই কেন্দ্রে। বার্ষিক প্রদর্শনীতে উদ্ভাবিত এই সামগ্রীগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানান ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবনা ও প্রকল্পকে নিয়ে কাজ করা হয় এই কেন্দ্রে। কোনও প্রাথমিক ভাবনা থেকে শুরু করে পণ্য তৈরি অবধি সমস্ত স্তরেই পাশে থাকে এই কেন্দ্র। সম্প্রতি CFI দল 'আবিষ্কার' এক বিরল কৃতিত্বের নজির সৃষ্টি করেছে। এই দল SpaceX সংস্থার হাইপারলুপ (সবচেয়ে দ্রুত গতির যান) প্রতিযোগিতায় এশিয়ার একমাত্র দল হিসাবে অংশ নিয়েছে এবং প্রথম পঁচিশটি দলের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। এই কেন্দ্রে প্রকৃত কারিগরি মানসিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া হয়।

অনুরূপভাবে, দেশে পড়ুয়াদের অনেক ফর্মুলা রেসিং কার টিম রয়েছে (যেমন,

[লেখক ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইসার, সেন্টার ফর ইনোভেসন, নির্মাণ প্রি-ইনকিউবেশন সেন্টার এবং সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাপ্লায়েড মেকানিকস্, IIT মাদ্রাজ। ই-মেল : satya@iitm.ac.in]

Team Raftar, IITM-এর ছাত্রদের ফর্মুলা রেসিং দল

IITM Raftar) যারা নিয়মিত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং খেতাব জেতে। শিক্ষার্থীদের এই দলগুলি অত্যাধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তি, যেমন স্বয়ংক্রিয় যান, ড্রোন, রোবোটিক্স, কম্পিউটার ভিশন, ডেটা অ্যানালিসিস, জেনেটিক্স ইত্যাদিতে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। CFI-এর মতো কেন্দ্রগুলি স্টুডেন্ট ইন্টারেস্ট ক্লাব গঠনেও উৎসাহ দেয় এবং সেইসঙ্গে দেশের সামাজিক প্রয়োজনগুলি অনুসারে প্রযুক্তিকে কাজে লাগনোর পথনির্দেশও দিয়ে থাকে। বিপর্যয় পরবর্তী উদ্ধারকার্য, স্মার্ট কৃষি পদ্ধতি, পুনর্বাসন, অনগ্রসরদের শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে উদ্ভাবনের প্রভূত সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে থাকেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের চিন্তাভাবনাগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করে, তাদের মনে আত্মবিশ্বাস জোগায়।

অনুঘটক হিসাবে উদ্ভাবন

উদ্ভাবন কেন্দ্রগুলি দলবদ্ধভাবে কাজ করতে উৎসাহ দেয় এবং শ্রেণিকক্ষের রুটিনবদ্ধ পড়াশোনার বাইরে নানান কর্মকাণ্ডেও সাহায্য করে। মাল্টিজেনারেশনাল পণ্য (সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে পণ্যকে আরও উন্নত করতে হয়) উৎপাদনের গবেষণার ক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে দায়িত্ব নিতেও উৎসাহ দেয় এই কেন্দ্রগুলি। নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়ে শিক্ষার্থীরা এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসে। তারপর বিভিন্ন উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও সেই গবেষণাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে এই শিক্ষার্থীরা বাস্তব দুনিয়ার মুখোমুখি হতে শেখে। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনগুলিকে যখন আরও উন্নত রূপ দেওয়া হয়, তখন তাদের এই পরিশ্রম সার্থক হয়।

দেশের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আইআইটি-এর মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশই নিজেদের একেকটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে মেলে ধরছে। এখন শিক্ষার্থীরাও আরও বেশি করে গবেষণায় এগিয়ে আসছে। এখন, স্নাতক স্তরের চেয়ে অনেক বেশি পড়ুয়া রয়েছে স্নাতকোত্তর স্তরে, যারা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া, বর্তমানে জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে এইসব প্রতিষ্ঠানে। যেমন, ডিপ লার্নিং (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটি শাখা), নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস এবং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যানালিটিক্স, ফিনান্সিয়াল অ্যানালিটিক্স, স্মার্ট শহর, সিস্টেমস বায়োলজি ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ-সহ নানান বিষয়ে পরবর্তী প্রজন্মের মৌলিক গবেষণার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে সম্প্রতি স্থাপিত রবার্ট বস্চ সেন্টার ফর ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (RBCDSAI)। অন্যদিকে, কমবাসচন বা দহন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আধুনিক গবেষণার লক্ষ্যে বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যে ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমবাসচন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (NCCRD) গড়ে তোলা হয়েছিল সেটি ইতোমধ্যেই মাইক্রো গ্যাস টারবাইন, এমিশন সেন্সর, ইলেকট্রিক প্লেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্টার্ট-আপ তৈরি করেছে। শুধুমাত্র IITM-তেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের যে ২৪-টি উৎকর্ষ কেন্দ্র রয়েছে সেগুলি নতুন নতুন ভাবনার জন্ম দিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলিতেও এই ধরনের উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে উঠছে। সব মিলিয়ে এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

বিভিন্ন সমস্যা

উদ্ভাবনের পুরো প্রক্রিয়াকে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। (১) নতুন ভাবনা; (২) প্রাক্-ইনকিউবেট (ভাবনাগুলি কতটা বাস্তবসম্মত, তা বাজারে লাভজনক হবে কিনা এইসব বিচার করে বিশেষ বিশেষ ভাবনাগুলিকে বেছে নেওয়া হয় এই স্তরে, তাতে অযথা অর্থের অপচয় ও পরিশ্রম এড়ানো যায়); (৩) ইনকিউবেট (এই স্তরে বেছে নেওয়া বিশেষ ভাবনাগুলির ওপর উন্নত গবেষণার সুযোগ করে দেওয়া হয়); (৪) সহায়তা (এই পর্যায়ে নতুন ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করে স্টার্ট-আপ গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়)। এর মধ্যে ইনকিউবেশন ও সহায়তার পর্যায় দুটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আইআইটি-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এই কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এইসব প্রতিষ্ঠানে গোড়া থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গড়ে ওঠা প্রথম দিককার ইনকিউবেটরগুলির মধ্যে আইআইটি, বম্বের সোসাইটি ফর ইনোভেশন অ্যান্ড অন্ত্রেপ্রেনিওরশিপ (SINE) অন্যতম।

প্রযুক্তিকেন্দ্রিক বিভিন্ন স্টার্ট-আপ এবং সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করে আসছে এই সোসাইটি। একই রকমভাবে আইআইটি, দিল্লির ফাউন্ডেশন ফর ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার (FITT) ১৯৯২ সাল থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা দিয়ে আসছে। সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের পিএইচডি-থিসিসের ওপর ভিত্তি করে স্টার্ট-আপ গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই কেন্দ্র। দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণা পার্ক গড়ে তুলেছে আইআইটি, মাদ্রাজ যেখানে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির পাশে স্টার্ট-আপগুলিকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণা পার্কের ভেতরে আইআইটি, মাদ্রাজ-এর তরফে যে ইনকিউবেশন সেল গড়ে তোলা হয়েছে সেটি ডিপ-টেকনোলজিকেন্দ্রিক ২০০-টিরও বেশি সংস্থাকে সহায়তা দিচ্ছে। এই সংস্থাগুলির বাজার মূল্য ৬,৫০০ কোটি টাকারও বেশি। আইআইটি, মাদ্রাজ থেকে যে স্টার্ট আপগুলি উঠে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে Ather (দেশের প্রথম IIOT চালিত স্কুটার), Planys (আন্ডার ওয়াটার রোবোটিক্স), Detect (প্রসেস ইন্ডাস্ট্রির জন্য অত্যাধুনিক অ্যাসেট মনিটরিং) এবং AirOK (পরবর্তী প্রজন্মের এয়ার পিউরিউফায়ার)-এর মতো নামী সংস্থা।

আইআইটি, মাদ্রাজ-এ গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার যে সমাধান সূত্র পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতেই এই স্টার্ট-আপগুলি গড়ে উঠেছে।

তবে গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এহেন রূপান্তর নেহাতই ব্যতিক্রমী ঘটনা। CFI-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন এক হাজারের কিছু বেশি শিক্ষার্থী। ওদিকে, শুধুমাত্র আইআইটি, মাদ্রাজ, এই স্নাতকোত্তর স্তরে তিন হাজারেরও বেশি গবেষক রয়েছেন। দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বহু গবেষক রয়েছেন। এই মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃত উদ্ভাবক ও শিল্পোদ্যোগী হয়ে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই। প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে এটি একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। তবে পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের বাইরে গিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করাটা মোটেই সহজ নয়। এমন সমস্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা দরকার যেখানে গবেষণা ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাজারের চাহিদা মেটাতে পারে।

প্রাক্-ইনকিউবেশনের গুরুত্ব

বিভিন্ন ইনকিউবেটর (যেমন, CIIE, IITM-IC ইত্যাদি) ও সাপোর্ট সিস্টেমগুলি (যেমন, Keiretsu, TiE, Chennai angels ইত্যাদি) সদ্য গড়ে ওঠা স্টার্ট-আপগুলিকে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা দান করে। নেটওয়ার্কিং-এর ক্ষেত্রেও সেগুলিকে সাহায্য করে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা ব্যবসায়িক সংস্থা হিসাবে সেগুলির দ্রুত বিকাশেও সহায়তা দিয়ে থাকে। গবেষণা ও টিংকারিং ল্যাবগুলিতে নতুন ভাবনার জন্ম হয় ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। এই ডিজিটাল যুগে হ্যাকাথনের ধারণাও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একসঙ্গে অনেকে একজোট হয়ে অতি দ্রুত কোনও পণ্যের একটা মডেল তৈরি বা কোনও সমস্যার সমাধানের পথ বাতলে দেওয়ার জন্যই হ্যাকাথনের আয়োজন। দূষণহীন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি আসে তা সমাধানের জন্য আইআইটি, মাদ্রাজের কাছে রয়েছে কার্বন জিরো চ্যালেঞ্জ (CZC) যার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিভিন্ন ভাবনার বিচারবিশ্লেষণ হয় এবং প্রোটোটাইপ (যেখানে এই জিনিসের নানা মডেল তৈরি করা হয় তারপর যেটা সবচেয়ে কার্যকরী সেটিকে বেছে নেওয়া হয়) তৈরিতে সাহায্য করা হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে এমন অনেক হ্যাকাথন বা বিজনেস প্ল্যান প্রতিযোগিতা হয়েছে, যাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। এগুলি থেকে কোনও ব্যবসায়িক সংস্থা গড়ে ওঠেনি। কিছু কিছু স্টার্ট-আপ হয়তো গড়ে উঠছে, কিন্তু সেগুলি পুঁজির অভাবে ধুঁকছে। প্রাথমিক পুঁজি জোগাড়ের পর পরবর্তী ক্ষেত্রে আর পুঁজি জোগাড় করতে পারেনি। তাই যেকোনও উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাক্-ইনকিউবেশন স্তরেই যে সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রয়োজন তা এখন বড়ো বেশি করে বোঝা যাচ্ছে। ব্যবসার নতুন উদ্যোগগুলিকে বাজারের ঝুঁকি সমালানোর উপযোগী করে তোলা হয় এই প্রাক্-ইনকিউবেশন স্তরে। এই স্তরে সম্ভাব্য বাজার খোঁজা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বা পরিষেবাটি বাজারের চাহিদা মেটানোর পক্ষে উপযোগী কিনা তাও খতিয়ে দেখা হয় এই পর্যায়ে। তাছাড়া সম্ভাব্য ক্রেতাদের খোঁজা ও সেই অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারেও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আইআইটি, মাদ্রাজে রয়েছে প্রি-ইনকিউবেটর 'নির্মাণ'। এখানে বিভিন্ন ভাবনাকে বেছে

২০১৯ সালে Space X, ক্যালিফোর্নিয়ায় Team Avishkar

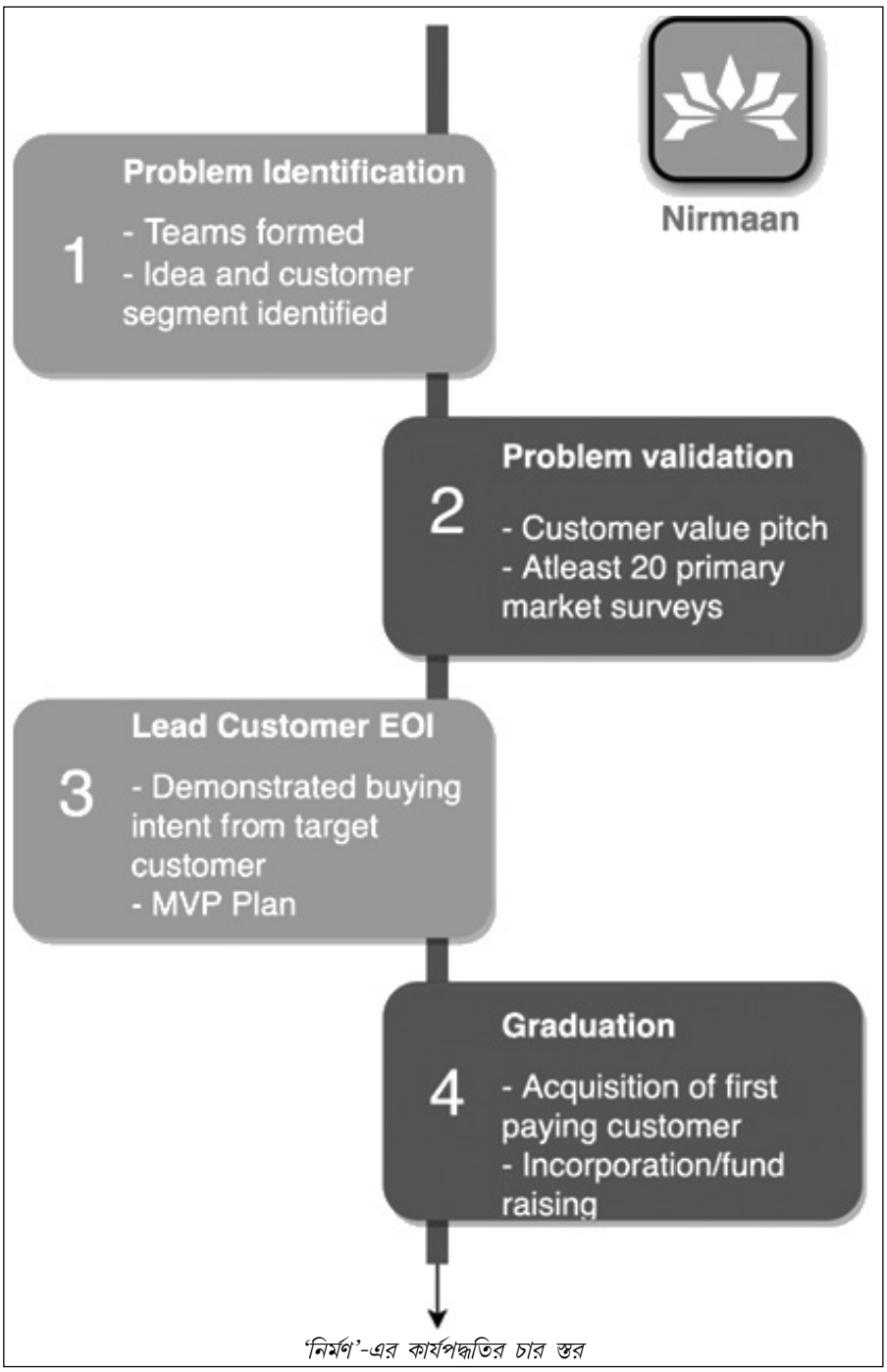

'নির্মাণ'-এর কার্যপদ্ধতির চার স্তর

নিয়ে ইনকিউবেশন স্তরে পাঠানো হয়। এখানে উদ্যোগী দলগুলিকে তাদের ভাবনার কার্যকারিতা প্রমাণ করে, বাজার খুঁজে স্টার্ট-আপ গড়ে তোলার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

CFI-এর সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার লক্ষ্যেই ২০১৫ সালে গড়ে ওঠে 'নির্মাণ'। বর্তমানে কেন্দ্রটি উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও সহায়তা দিচ্ছে।

'নির্মাণ'-এর কার্যপদ্ধতির চারটি স্তর রয়েছে। যথা—সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রাথমিক বাজার সমীক্ষার মাধ্যমে কার্যকারিতা প্রমাণ, বাজারে টিঁকে থাকতে পারে এমন পণ্য/পরিষেবা তৈরি এবং সবশেষে স্টার্ট-আপ গড়ে তোলা। শেষের স্তরটিতেই নিজেদের সংস্থাকে নথিভুক্ত করে ব্যবসা শুরু করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়া হয়। এর আগে প্রাক্-ইনকিউবেশন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারে, সেইসঙ্গে, সেইসমস্ত সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারে যার সমাধান তাদের পণ্য/পরিষেবা করতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কোহর্টে (যে দলের সদস্যদের কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে) ভাগ করে দেওয়া হাতে পারে যাতে তারা একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। তারপর, এই প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রাক্তনীদের সঙ্গে কাজের সুযোগও তাদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়।

তবে CFI বা অন্যান্য গবেষণাগার থেকে প্রাথমিকভাবে যে ভাবনাচিন্তা উঠে এসেছে তার মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটিকেই স্টার্ট-আপের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে যে অনিশ্চয়তা রয়েছে মূলত তার জন্যই বেশিরভাগ ভাবনাচিন্তা শুধু আলোচনার স্তরেই রয়ে যায়। স্টার্ট-আপের রূপ নিতে পারে না।

উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা চারিয়ে দেওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেকথা উপলব্ধি করে সেই ১৯৮৩ সালেই উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম (অন্ত্রেপ্রেনিওরশিপে এমএস) চালু করেছিল আইআইটি, মাদ্রাজ। তবে সময়ের তুলনায় বড়ো বেশি এগিয়েছিল এই পাঠক্রম। তাই ইতিবাচক সাড়াও মেলেনি। বর্তমানে উদ্ভাবন ও উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতার যেভাবে প্রসার ঘটছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আইআইটি, মাদ্রাজ সম্প্রতি উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কিত প্রথম স্তরের একটি ঐচ্ছিক পাঠক্রম চালু করেছে। রুটিনবদ্ধভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবন ও উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তৈরি করাই এই পাঠক্রমের লক্ষ্য। সেইসঙ্গে নিয়মিত সংশ্লিষ্ট পণ্য/পরিষেবাটির কার্যকারিতা পরীক্ষা ও তা প্রমাণ, বাজারের চাহিদা ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের চিহ্নিত করার পাঠও থাকছে এখানে। ইতোমধ্যেই এই পাঠক্রমটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৪০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী এই পাঠক্রমে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। অথচ এই পাঠক্রমে আসন সংখ্যা মাত্র ৩০। উদ্যোগ

CFI, IITM-এর ছাত্রদের দ্বারা নির্মিত Autonomous Ground Vehicle—Abhiyaan

গ্রহণ সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক পঠনপাঠনের চাহিদা যে ক্রমশই বাড়ছে এ তারই প্রমাণ। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বমানের পরিকাঠামোয় বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এবার উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিগুলি যাতে গবেষণাগারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বাজারে ছড়িয়ে পড়তে পারে তা নিশ্চিত করাটা জরুরি।

ইনোভেশন কর্প (I-Corps) কর্মসূচির মাধ্যমে গবেষণাগার থেকে বাজারে পৌঁছনোর ধারণাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন ((NSF)। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের বাইরে বেরিয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলির বাণিজ্যিকীকরণে মনোযোগ দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই কর্মসূচিতে। এইভাবেই NSF-এর অনুদানপুষ্ট মৌলিক গবেষণা প্রকল্পগুলির সামাজিক কার্যকারিতা বাড়াতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে I-Corps। এই কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৬০০-টিরও বেশি স্টার্ট-আপ গড়ে উঠেছে এবং ২৩০-টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৫০-টিরও বেশি দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত এই দলগুলি তাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সম্ভাব্য বাজারও খুঁজে থাকেন। এই কর্মসূচি চালু হওয়ার পর অনেক শিক্ষকেরই মানসিকতা বদলেছে এবং আরও বেশি করে সমাজের কাজে লাগার সংকল্প নিয়েছেন তাঁরা।

আইআইটি, মাদ্রাজ-এ এই ধরনেরই 'গবেষণাগার থেকে বাজার' কর্মসূচি চালু হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের দুই বিশিষ্ট প্রাক্তনী ড. গুরুরাজ দেশপাণ্ডে (দেশ) এবং কৃশ গোপালকৃষ্ণনের দেওয়া অর্থেই এই কর্মসূচির সূচনা। I-Corps কর্মসূচির আদলে গড়ে তোলা গোপালকৃষ্ণন-দেশপাণ্ডে সেন্টারের (GDC) I-NCUBATE কর্মসূচির আওতায় 'গবেষণাগার থেকে বাজার'-এ পৌঁছনোর জন্য আট সপ্তাহ ধরে কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে সূচনা। তখন সাতটি I-NCUBATE কর্মসূচি পরিচালনা করেছে GDC এবং দেশের চারটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০ জন শিক্ষক ও চারশোরও বেশি উদ্যোগপতিকে নিয়ে গঠিত ৭০-টিরও বেশি দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের ফলস্বরূপ এই সময়কালের মধ্যে প্রায় ২৫-টি স্টার্ট-আপ গড়ে উঠেছে। অংশগ্রহণকারীরা যেসব ভাবনার কথা জানান তার ৪৫ শতাংশের ক্ষেত্রেই যে কোনও বাজার পাওয়া যায় না এই সত্যিটাও উঠে এসেছে এই কর্মসূচিতে। তবে পরবর্তীকালে শিক্ষকরা যেসব গবেষণার কাজে হাত দেবেন বা বাজার তথা সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখে তারা তাদের শিক্ষামূলক কাজকর্ম কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তা দেখেই এই প্রশিক্ষণের বৃহত্তর প্রভাব মূল্যায়ন করা যাবে।

সামনের পথ

এদেশে ডিপ টেকনোলজিতে উদ্ভাবনের ক্ষেত্র যে দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সমাজের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে দ্রুত পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজে এগিয়ে আসছে আইআইটি-র মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শুধু ভালো কর্মী তৈরি করলেই চলবে না, বরং এখানে অনেক অনেক ভালো নিয়োগকারী তৈরি করতেই হবে যারা দেশের পরবর্তী প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের মনে উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া, সীমিত সহায়সম্পদ নিয়ে পণ্য/পরিষেবা তৈরি এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে পারবে এবং এইভাবেই ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার জাতীয় লক্ষ্যপূরণে নিজেদের অবদান রাখতে পারবে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-২০২১

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

দৃষ্টিহীনদের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তি

আর. এস. চৌহান

একবিংশ শতকে দেশজুড়ে চলে সর্বশিক্ষা অভিযান এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। দু'টি অভিযানেই দৃষ্টিহীন শিশুদের দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থা করা হয়েছিল অর্থসাহায্য, পাঠসহায়ক সরঞ্জাম এবং বিশেষ শিক্ষকের। পরবর্তীকালে এই প্রকল্পগুলি একত্রিত করে নাম দেওয়া হয় 'সমগ্র শিক্ষা'। এতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সার্বিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। এই নিবন্ধে দৃষ্টিহীনদের জন্য শিক্ষার সামগ্রিক চিত্রের পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে এক্ষেত্রে আগামী দিনে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনার হাত ধরে আসা অগ্রগতির রূপরেখাও।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের কথা। এক দৃষ্টিহীন বালক স্কুলে ভর্তি হতে চায়। দেখা করল স্কুলের অধ্যক্ষের সঙ্গে। অধ্যক্ষ বালকের অনুরোধ উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ''তোমাকে ভর্তি করা অসম্ভব। তুমি স্কুলে গেলেই তো অন্য ছেলেরা সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে হাসবে, রঙ্গরসিকতা করবে। পড়াশোনার বারোটা বেড়ে যাবে।''

এর প্রায় দু' দশক পর এক দৃষ্টিহীন কিশোর স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে চেয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা একটি নামজাদা কলেজে গেল। সেটা ছিল ১৯৭০ সালের জুন মাসের এক তপ্ত দুপুর। পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও প্রস্তুতির ভিত্তিতে সে অনায়াসে ওই কলেজে ভর্তি হতে পারবে বলে কিশোরটি নিশ্চিত ছিল। কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে বিশাল চওড়া এক টেবিল। সেই টেবিলের ওধার থেকে অধ্যক্ষ বললেন, ''আমাদের ক্লাসরুম কিন্তু দোতলায়।'' কিশোরটির উত্তর, ''স্যার, স্কুলে আমার ক্লাসরুমও দোতলায় ছিল।'' অধ্যক্ষ বললেন, ''বেশ। তবে তোমাকে ভর্তি করার আগে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে হবে।''

টাইপ করা একটি কাগজ অধ্যক্ষের সামনে রেখে প্রত্যয়ী কণ্ঠে কিশোরটি বলল, ''স্যার, এটা দেখুন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ তাদের ৩৩তম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা যেকোনও কলেজে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।''

এই যুক্তির সামনে আর কিছু বলার মতো বক্তব্য না পেয়ে রুষ্ট গলায় অধ্যক্ষ বললেন, ''তুমি তো উকিলের মতো কথা বলছো হে!''

কলেজের গেট থেকে বেরিয়ে হতাশ কিশোরটি ম্লানমুখে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময়ে এক তরুণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে কিশোরটির সমস্যার কথা শুনে তাকে অন্য একটি কলেজে নিয়ে গিয়ে ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হয়ে কিরোরিমল কলেজে ভর্তি হয় সেই কিশোর। তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস।

এই পুরো বিষয়টা এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার মনে জ্বলজ্বল করছে, যে মনে হয় যেন এই তো সেদিনের ঘটনা। দয়ালু যে তরুণটি সেদিন আমাকে সাহায্য করেছিল, সে নিজে বধির ছিল। পরবর্তীকালে সে আমার খুব ভালো বন্ধু হয়ে যায়।

একথা সত্য যে, গত সহস্রাব্দে এই প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা সুরদাস, গাট্টু মহারাজ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দের মতো কয়েকজন অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিত্বকে পেয়েছি। কিন্তু তাদের কথা আলাদা। ঐকান্তিক প্রয়াস ও উদ্যম এবং অসাধারণ প্রতিভায় তারা নিজস্ব এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর একদম শেষদিকে সাধারণ দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের নানা প্রয়াস শুরু হয়। এই শিক্ষাদানের প্রয়াসকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব, স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব এবং আধুনিক পর্ব, যার সূত্রপাত একবিংশ শতাব্দীতে।

১৮৮৭ সালে মিস অ্যানি শার্প নামে এক অ্যাংলো মহিলা অমৃতসরে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। মালা গাঁথা, খাগড়ার কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'ত, পড়ানো হ'ত ধর্মগ্রন্থ।

ক্রমে খুব ধীরে ধীরে দেশের অন্যান্য জায়গাতেও একটি-দু'টি করে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। কেউ দয়া করে, কেউ করুণার বশবর্তী হয়ে এগিয়ে এলেন। কেউ বা চাইলেন, দৃষ্টিহীনরাও অন্তত কিছুটা

[লেখক প্রাক্তন প্রধান, Department of Special Education and Disability Studies, NNH, দেরাদুন। গুটিবসন্তের কারণে মাত্র চার বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ই-মেল : chauhan.ddn@gmail.com]

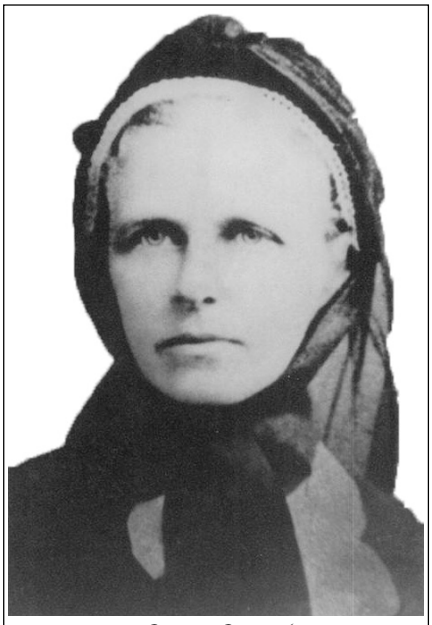

মিস অ্যানি শার্প

লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার ক্লুথা ম্যাকেঞ্জি

লেখাপড়া শিখুক। মিস জেন আস্কউইথ নিজে ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী। দৃষ্টিহীনরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য তাদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগী হলেন তিনি। ১৮৯০ সালে এই কাজ শুরু করেছিলেন এবং ইংল্যান্ড ফিরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ক্রমাগত এর প্রসার ও উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। আবার ১৯০০ সালে খরার সময়ে কয়েকটি গ্রামের গরিব কয়েকজন দৃষ্টিহীনকে নিয়ে মিস মিলারড নামে এক মহিলা বোম্বেতে একটি পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ে তুললেন। পরবর্তীকালে এটি একটি চমৎকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ক্রমশ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত এক সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, অবিভক্ত ভারতে এই ধরনের মোট ৩২-টি প্রতিষ্ঠান ছিল। তবে এগুলির মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটিতেই দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। অন্যগুলো মূলত ছিল গৃহহীন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মধ্যযুগীয় আবাসস্থল।

ওই সময়কার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

- কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা;
- সর্বভারতীয় ব্রেইল কোড না থাকা; উল্লেখ্য ব্রেইল এক ধরনের ডটভিত্তিক স্পর্শনির্ভর ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দৃষ্টিহীনরা পড়তে ও লিখতে পারেন;
- দেশে ব্রেইল পদ্ধতির ছাপাখানা না থাকা;
- দৃষ্টিহীনদের প্রয়োজনীয় কোনও সাজ-সরঞ্জামেরই উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকা।

১৯৪৭ সালটা দেশের পক্ষে যেমন, তেমনি দৃষ্টিহীনদের কাছেও এক সন্ধিক্ষণ ছিল। এই বছরেরই এপ্রিল মাসে শিক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি ছোটো কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৪৪ সালে দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কিত একটি সরকারি প্রতিবেদনের সুপারিশ মেনে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার ক্লুথা ম্যাকেঞ্জি এই প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন। দৃষ্টিহীন সেনা হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেবার অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেছিলেন প্রতিবেদনে। ১৯৪২ সালে সরকার তাকে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (দৃষ্টিহীনতা) হিসাবে নিয়োগ করেছিল। তার কাজ ছিল, যুদ্ধে যেসব সেনা আহত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং ভারতীয় দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেওয়া।

ভারত এবং অন্যান্য দেশে বসবাসকারী দৃষ্টিহীনদের সুবিধার্থে সেই সময় ভারত সরকার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। সারা বিশ্বে ব্রেইল কোডে সমতা আনতে ইউনেস্কোকে অনুরোধ জানানো হয় সরকারের পক্ষ থেকে। আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার পর ইউনেস্কো বিভিন্ন ভাষায় ব্রেইল কোড প্রণয়নের সাধারণ নীতি নির্দেশিকা চূড়ান্ত করে। ১৯৫১ সালে ভারতের বিভিন্ন ভাষার জন্য অভিন্ন ব্রেইল কোড গ্রহণ করে সরকার। এই একটি সিদ্ধান্ত অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ, ভবিষ্যতের ওপর এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত অর্থেই এটি এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল।

অভিন্ন ব্রেইল কোড না থাকার সমস্যা মিটে যাবার পর সরকার ১৯৫২ সালে দেরাদুনে প্রথম ব্রেইল ছাপাখানা স্থাপন করে। নাম সেন্ট্রাল ব্রেইল প্রেস। তার পরের দশক থেকে সরকার চারটি আঞ্চলিক ব্রেইল ছাপাখানাকে আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালে গড়ে ওঠে ব্রেইলের সহায়ক সরঞ্জাম উৎপাদনের কারখানা। সেখানে ব্রেইল স্লেট, স্টাইলাস, গাণিতিক বোর্ড, বিভিন্ন রকম টাইপ, মনোরঞ্জনের কিছু উপকরণ, সূঁচ, ভাঁজ করা সাদা লাঠি প্রভৃতি তৈরি করা হ'ত।

অভিন্ন ব্রেইল কোড, ব্রেইল ছাপাখানা এবং সরঞ্জাম উৎপাদনের একটি মোটামুটি ব্যবস্থা হবার পর দৃষ্টিহীনদের জন্য স্কুলের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে লাগল। অসরকারি সংগঠনগুলি ছাড়াও এই কাজে সরকারও এগিয়ে আসে। সরকারি উদ্যোগে দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম স্কুল ১৯৫৯ সালে দেরাদুনে স্থাপিত হয়, যার নাম মডেল স্কুল ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন। দৃষ্টিহীনদের জন্য স্কুল স্থাপনে এগিয়ে আসে কয়েকটি রাজ্য

সরকারও। ১৯৬৪ সালে এমন স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৫। ১৯৯৫ সালে সংখ্যাটি বেড়ে হয় ২৫০।

বর্তমানে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষকের বিশেষ অভাব রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে আগে অল্পবিস্তর চেষ্টা হয়েছে, তবে তাতে খুব একটা সুফল পাওয়া যায়নি। পরে সরকার এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে একটি প্রকল্প শুরু করে। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৬০ সালে দৃষ্টিহীনদের জন্য শিক্ষক গড়ে তুলতে বোম্বে, দিল্লি, কলকাতা ও মাদ্রাজে চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ছোটো আকারে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হলেও তা বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছেও পৌঁছে যায়।

১৯৭৪ সালে এল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভারতের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য এক সার্বিক শিক্ষাপদ্ধতি, Integrated Education for Disabled Children (IEDC)-র সূচনা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি দৃষ্টিহীন পড়ুয়াকে শিক্ষক, সাজসরঞ্জাম এবং পঠনপাঠনের সামগ্রীর জন্য অর্থসাহায্যের সংস্থান রয়েছে। প্রথম দশ বছরে অবশ্য এই কর্মসূচি তেমন প্রসারলাভ করেনি। কিন্তু এইসব ব্যবস্থা ও বৃত্তির মাধ্যমে দৃষ্টিহীন শিশু-কিশোরদের সামনে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে পড়াশোনার দরজাটা খুলে গেল। পরবর্তী দশকগুলিতে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়েছে।

সহজ করে বলতে গেলে, এই প্রকল্পে মূলত শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই ১৯৮২ সালে এটি শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে নিয়ে আসা হয়। NCERT, নতুন দিল্লিতে একটি সেল খোলা হয়, যা পরবর্তীকালে পরিণত হয় একটি পৃথক দপ্তরে। ১৯৮৭ এবং ১৯৯২ সালে এই প্রকল্পে কিছু সংশোধন করা হয়। এর ফলে আরও বেশি সংখ্যক দৃষ্টিহীন শিশু এর সুবিধা ভোগ করতে পারে। ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, জাতীয় শিক্ষা নীতিতে, ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের পঠনপাঠনকেও মূল ধারার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ক্রমশ ভিন্নভাবে সক্ষমরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে লাগলেন, নিজেদের সংগঠিত করে তুললেন এবং ভারত, রাষ্ট্রসংঘের এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ ও রূপায়ণে উদ্যোগী হল। ১৯৮১ সালটিকে রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা মতো ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সময়কালকে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে পালন করা হয় ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য দশক হিসাবে। ঠিক তার পরেই ১৯৯২ সালে বেজিং-এর বৈঠকে রাষ্ট্রসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কমিশন (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific—ESCAP) সিদ্ধান্ত নেয় ওই অঞ্চলে ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য দশক উদ্‌যাপনের। তাতেও শামিল হয় ভারত।

১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক ভিন্নভাবে সক্ষম বর্ষ উদ্‌যাপনের পর বিপুল সংখ্যক অসরকারি সংগঠন, স্বয়ংশাসিত সংস্থা এই ক্ষেত্রে কাজ করতে উদ্যোগী হয়, এমনকী সরকারি স্তরেও সক্রিয়তা চোখে পড়ে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের কর্মসূচি চালু হয়। একটি ন্যূনতম মান যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৯২ সালে ভারতীয় পুনর্বাসন পরিষদ আইন (Rehabilitation Council of India Act—RCI) পাস করে। বেজিং বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয় প্রতিবন্ধী (সমান সুযোগ, অধিকার রক্ষা ও সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫। এই আইনে ভিন্নভাবে সক্ষমদের সাধারণ এবং বিশেষ স্কুল ও ঘরোয়া প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কথা বলা হয়েছে। তারা যাতে সবরকম সুযোগসুবিধা পান, সেজন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগাড় ও গবেষণার সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভিন্নভাবে সক্ষমদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এই আইনে। ব্যঙ্গ করে একে 'দন্তবিহীন ব্যাঘ্র' বলা হলেও এই আইন যে ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ ও দশক পালন এবং ESCAP ঘোষণাপত্র প্রভৃতির জেরে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য উচ্চমানের সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। কখনও সেই প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, কখনও বা দেশেই তৈরি হয়। এর মধ্যে রয়েছে ইন্টারপয়েন্ট স্লেট, মেকানিক্যাল রাইটার, শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষার নানা যন্ত্র, কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য স্ক্রিন রিডার, একদিনে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ছাপতে পারে, এমন ব্রেইল প্রিন্টার প্রভৃতি। ১৯৮৪ সালে ইউনেস্কোর Salamanca Statement প্রকাশের পর ভারত সরকার ও অন্যরা ক্রমাগত যে প্রয়াস চালিয়ে গেছে তাতে সাধারণ শিশু ও ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের মধ্যে কোনও ফারাক করা হয়নি। শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণে দু'পক্ষের প্রতিই সমান নজর দেওয়া হয়েছে।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি দেশের নির্বাচিত কিছু জেলায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায়

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়। একবিংশ শতকে দেশজুড়ে চলে সর্বশিক্ষা অভিযান এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। দু'টি অভিযানেই দৃষ্টিহীন শিশুদের দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থা করা হয়েছিল অর্থসাহায্য, পাঠসহায়ক সরঞ্জাম এবং বিশেষ শিক্ষকের। পরবর্তীকালে এই প্রকল্পগুলি একত্রিত করে নাম দেওয়া হয় 'সমগ্র শিক্ষা'। এতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সার্বিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। 'প্রতিবন্ধী' শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' শব্দবন্ধ। এর প্রভাব ছিল সুদূরবিস্তৃত। উপজাতি সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুরাও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। ফলে তারাও এই প্রকল্পের আওতায় চলে আসে। তবে দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার কাজটি একেবারেই আলাদা এবং অনেক বেশি কঠিন।

প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদানের সময়ে এই বিষয়টি মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

এছাড়া প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহায়ক সরঞ্জাম কেনার জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় অর্থসাহায্যের সংস্থান রয়েছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রেইল প্রিন্টিং মেশিন কেনার জন্যও অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে দেশে কখনও ব্রেইল সামগ্রীর কোনও অভাব হবে না।

শুধু তাই নয়, অতি সম্প্রতি আমাদের দেশে কাগজবিহীন ব্রেইল রিডার ও রাইটারও এসেছে। এটি একটি বৈদ্যুতিন যন্ত্র, যেখানে যাবতীয় তথ্য একটি এসডি কার্ডে মজুত করা থাকে। একটি বোতাম টিপলেই লাইনের পর লাইন ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়া যায়। চাইলে, কেউ এই যন্ত্রের সাহায্যে লিখতেও পারেন।

প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের রীতিনীতির (UN Convention on Rights of Persons with Disabilities—UNCRPD) সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ (Rights of Persons with Disabilities—RPD Act, 2016) ভারতীয় সংসদে পাস হয়। এই আইনে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে আর একটি ভাগ করা হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে 'কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন'।

সব মিলিয়ে এই ক্ষেত্রে ভারতে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, অনেকটা এগিয়েছে ভারত। কিন্তু সাধারণ শিশু ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন শিশুদের উচ্চ গুণমানের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে চাইলে এখনও অনেক পথ হাঁটা বাকি। দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থাকা শিশু ও তাদের পরিবারের কাছে এই সমতাবিধান কাঙ্ক্ষিত তো বটেই, আরও বেশি করে প্রয়োজনীয় আমাদের সমাজের সর্বাত্মক বিকাশের জন্য।❑

দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা পরিষেবা দানের ক্রমপঞ্জি

১৮৮৭—অমৃতসরে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের সূচনা।
১৯৯৪—দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে সরকারি প্রতিবেদন রচনা এবং এতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার ক্লুথা ম্যাকেঞ্জির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।
১৯৪৭—কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন।
১৯৫১—বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার জন্য অভিন্ন ব্রেইল কোড গ্রহণ।
১৯৫২—দেরাদুনে ভারতের প্রথম ব্রেইল ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা।
১৯৫৪—ব্রেইলের সরঞ্জাম উৎপাদনের কারখানা স্থাপন।
১৯৫৯—দেরাদুনে দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য প্রথম সরকারি স্কুল স্থাপন।
১৯৬০—দৃষ্টিহীনদের জন্য শিক্ষক তৈরি করতে চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন।
১৯৭৪—ভারতে ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য এক সার্বিক শিক্ষাপদ্ধতি, Integrated Education for Disabled Children (IEDC)-র সূচনা।
১৯৮১—রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণামতো ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ উদ্‌যাপন।
১৯৮৩-'৯২—রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য দশক হিসাবে পালন।
২০১৬—প্রতিবন্ধকসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ (Rights of Persons with Disabilities—RPD Act, 2016) ভারতীয় সংসদে পাস।

সহায়ক সূত্র :

- Verma, V.P. (2008). Ek Yatra Smirtiyon Ki. Allied Publishers Pvt. Ltd. Delhi.
- Chauhan, R.S. (1994). Triumph of the Spirit. Konark Publishers. New Delhi.
- Chauhan, R.S. (1992). Chronological Development of Educational Services for the Visually Handicapped, In R.S. Chauhan (ed.), *Handbook for the Teachers of the Visually Handicapped*. National Institute for the Visually Handicapped. Dehradun.
- Ahuja, S.C. (1987). Pioneers in the Education and Rehabilitation of the Blind in India. Paper present in National Conference on Centenary of Services to the Blind, 4-6 January New Delhi.
- Report on Blindness in India. (1944). Govt. of India. New Delhi.
- Fifty Years of Work for the Blind. (1952). Govt. of India. New Delhi.
- Manual on Bharati Braille. (1980). National Institute for the Visually Handicapped.Dehradun:
- Pandey, R.S., Advani, L. (1995). Perspectives and Disability Rehabilitation. Vikas Publishing House. New Delhi.
- The Programme of Deputing Indian Teachers of the Blind for the Perkins Teachers Training Course - A Follow-up Study. (1978). National Association for the Blind. Bombay.
- Scheme of Integrated Education for the Disabled Children. (1992). Ministry of Human Resources Development. New Delhi.
- Scholarships for the Disabled Persons. (1982). Ministry of Social Welfare. New Delhi.
- Advani, L. (1987). Origin and Development of Services for the Blind, In Lal Advani (ed.), Manual of Office Management Training. All India Confederation of the Blind. New Delhi.
- The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights And Full Participation) Act, 1995. (1996). Govt. of India. Legislative Department. New Delhi.
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. (2016). Ministry of Law and Justice. New Delhi.

শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ

সংকলন : যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী

নয়া শিক্ষা নীতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় হাত লাগিয়েছে ভারত সরকার। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষাঙ্গন ও শিল্পক্ষেত্রে মানবসম্পদের অভাব ঘোচানোরও চেষ্টা চলছে। জাতীয় শিক্ষা নীতির খসড়া জমা দিয়েছে ড. কে. কস্তুরিরঙ্গন কমিটি। দেশের পরিবর্তনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার কথা মাথায় রেখে শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কার ও উন্নতিসাধনে বেশকিছু নতুন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক।

দেশ-এর পরিবর্তনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার কথা মাথায় রেখে শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কার ও উন্নতিসাধনে বেশকিছু নতুন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলায়। প্রকাশ করা হয়েছে ৫ বছরের পরিকল্পনা দিশাপত্র, Education Quality Upgradation and Inclusion Programme—EQUIP। SWAYAM 2.0 (SWAYAM—Study Webs of Active Learning for Young Aspering Minds), দীক্ষারম্ভ এবং PARAMARSH, এসব কর্মসূচির কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার

- **নিষ্ঠা (NISHTHA) :**

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচি—National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement বা NISHTHA-র লক্ষ্য হল তৃণমূল স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। এই সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৪২ লক্ষ শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধান, রাজ্যগুলির শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (SCERT) এবং জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (DIET)-এর শিক্ষক-প্রশিক্ষক, মহকুমা ও আঞ্চলিক স্তরে শিক্ষা সংক্রান্ত সমন্বায়কদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্তরে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিদর্শনমুনা (Standardised Training Module) তৈরি করা হচ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য। সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অবশ্য নিজেদের প্রেক্ষাপট, চাহিদা ও সক্ষমতা অনুযায়ী তাতে কিছু পরিমার্জন করে নিতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় স্তরের উদ্যোগটির মূল লক্ষ্যের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই।

- **ধ্রুব (DHRUV) :**

প্রধানমন্ত্রী উদ্ভাবনমূলক শিক্ষক কর্মসূচি DHRUV-এর লক্ষ্য হল সম্ভাবনাময় শিশুদের দক্ষতা ও জ্ঞানের বিস্তার। বিজ্ঞান, কলা-সহ যেকোনও বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাকে আরও বিকশিত করে তোলার মঞ্চ এই কর্মসূচি। পরবর্তীতে এই ছেলে-মেয়েরা নিজের

নিজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে দেশ ও সমাজকে সমৃদ্ধ করবে, এমনটাই চাইছে সরকার।

● **সমন্বিত অনলাইন মঞ্চ—Shagun :**

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো অনলাইন মঞ্চগুলির (junction) একটি হল Shagun (URL : http://shagun.govt.in/)। এই মঞ্চে রয়েছে ভারত সরকার এবং সব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচি সংক্রান্ত সব অনলাইন পোর্টাল। এর সঙ্গে সংযুক্ত প্রায় ১২০০ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ৬০০ নবোদয় বিদ্যালয়, CBSE নিয়ন্ত্রণাধীন ১৮,০০০ বিদ্যালয়, ৩০-টি SCERT এবং NTCE নিয়ন্ত্রণাধীন ১৯,০০০ সংস্থার পাশাপাশি সমধর্মী আরও নানা সংস্থা। ১৫ লক্ষ বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে এখানে।

মঞ্চটির মাধ্যমে ৯২ লক্ষ শিক্ষক এবং ২৬ কোটি শিক্ষার্থীকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষও তাদের মতামত পেশ করতে পারেন এখানে। এর ফলে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার প্রশ্নে আরও এগোনো যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

● **শিক্ষা পরিষেবা সংক্রান্ত একীকৃত তথ্য ব্যবস্থাপনা—United District Information System for Education Plus (UDISE+) :**

দেশের প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট গুণমানের নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পেতে চালু করা হয়েছে পরিমার্জিত UDISE+। দেশের ১৫ লক্ষেরও বেশি বিদ্যালয়ের অবস্থান-সহ নানা বিষয়ে তথ্য এখানে GIS-ভিত্তিক মানচিত্রায়ণের মাধ্যমে সংরক্ষিত।

● **জ্ঞান আদান-প্রদানের জন্য ডিজিটাল পরিকাঠামো—Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA) 2.0 :**

DIKSHA (দীক্ষা) পোর্টাল চালু হয় ২০১৭ সালে। উদ্দেশ্য শিক্ষক সম্প্রদায়কে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণের জন্য ডিজিটাল মঞ্চের সুযোগসুবিধা দেওয়া। শিক্ষকদের জন্য প্রস্তুত e-content-এর মানোন্নয়ন এবং তার প্রসারের পথ আরও মসৃণ করে দিয়েছে এই উদ্যোগ। এখনও পর্যন্ত ৬৭ হাজার বিষয়বস্তুর খণ্ড উপলব্ধ করা হয়েছে DIKSHA পোর্টালে এবং করা হয় ১০.৫ কোটি স্ক্যান।

● **ডিজিটাল বোর্ড অভিযান :**

২০২৩-এর মার্চের মধ্যে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১,০১,৯৬৭-টি সরকারি, ৪২,৯১৭-টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং ১,৭০৪-টি কেন্দ্রীয় ও নবোদয় বিদ্যালয়-সহ ১,৪৬,৫৮৮-টি বিদ্যালয়ে দু'টি করে স্মার্ট ক্লাসরুম-এর সংস্থান এই অভিযানের লক্ষ্য।

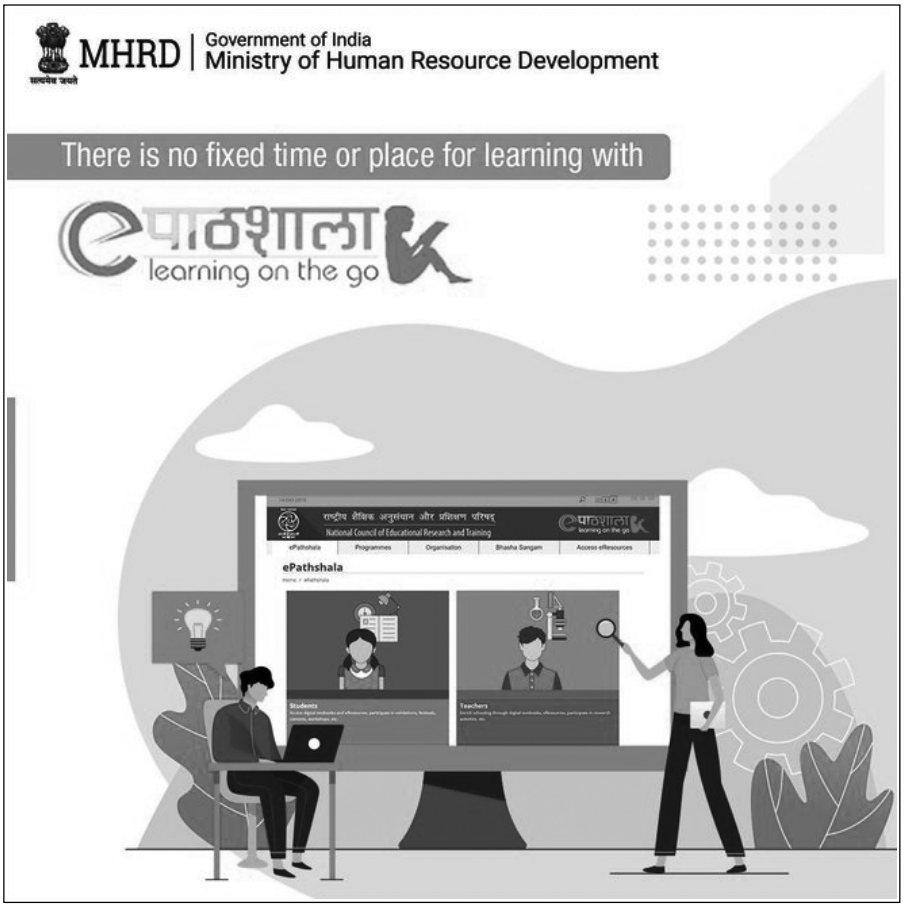

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কার

● শিক্ষা সংক্রান্ত গুণগত উৎকর্ষসাধন এবং অন্তর্ভুক্তিবিষয়ক (Education Quality Upgradation and Inclusion Programme—EQUIP) পঞ্চবার্ষিকী দিশা পরিকল্পনা :

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা বিভাগের এই কর্মপরিকল্পনায় শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষসাধন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়োগযোগ্যতার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৯-'২৪ এই ৫ বছর মেয়াদি উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছে ১০-টি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর পরামর্শ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে।

● নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের ১০-টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই তকমা দেওয়া হয়েছে। সরকারি সংস্থাগুলি হল IISc ব্যাঙ্গালোর, IIT দিল্লি, IIT বম্বে, IIT মাদ্রাজ, IIT খড়্গপুর, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্না বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি পাবে ১ হাজার কোটি টাকা করে। তালিকায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি হল BITS পিলানি, MAHE কর্ণাটক, Jio Institute, তামিলনাড়ুর অমৃতা বিশ্ববিদ্যাপীঠম এবং ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, নতুন দিল্লির জামিয়া হামদার্দ, ওড়িশার কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, হরিয়ানার ও. পি. জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, মোহালির সত্যভারতী ফাউন্ডেশন, ভারতী ইনস্টিটিউট এবং উত্তরপ্রদেশের শিব নাদার ইউনিভার্সিটি।

● SWAYAM 2.0 :

এই উদ্যোগের আওতায় শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অধ্যয়ন করা যাবে অনলাইনে।

● SWAYAM PRABHA—DTH শিক্ষা চ্যানেল :

৩২-টি DTH চ্যানেলে সর্বক্ষণ (২৪ × ৭) দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীরা নামমাত্র খরচে শিক্ষা পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন এই কর্মসূচির আওতায়। যারা শিক্ষক কিংবা ইন্টারনেট, কোনও দিক থেকেই পড়াশোনার ক্ষেত্রে সহায়তা পান না মূলত তাদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির যেসব শিক্ষার্থী পরবর্তীতে দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চান তাদের জন্য IITPAL চ্যানেল-এরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

● গুণগত উৎকর্ষসাধন কর্মসূচির রূপায়ণ :

☐ **দীক্ষারম্ভ :** প্রারম্ভিক দিশাদান কর্মসূচির আওতায় এসেছে ৩১৯-টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

☐ **শিক্ষালব্ধ ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনা ও পরিমার্জন [Learning Outcomes based Curriculum Framework (LOCF) Revision] :** এই কর্মসূচির আওতায় ১৬-টি বিষয়ের পরিমার্জিত নতুন পাঠক্রম নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওয়েবসাইটে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজেদের পাঠ্যসূচির অদলবদল করে নিতে সাহায্য করবে এই উদ্যোগ।

☐ **শিক্ষাদান এবং শিক্ষণ-এর সহায়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক পন্থা :** ১২৫-টি বিশ্ববিদ্যালয় SWAYAM মঞ্চের মাধ্যমে শামিল হয়েছে আদান-প্রদান (credit transfer)-এ।

☐ **ভারতের উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্যে বহু বিষয়ভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প (Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy—STRIDE) :** সংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে গবেষণা ও অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ।

☐ **PARAMARSH :** National Assessment and Accredition Council বা NAAC-এর স্বীকৃতি পেতে উৎসাহী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এই কর্মসূচি।❑

সূত্র : মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো

মুক্ত ও দূরশিক্ষা : আগামীর দিশায়

ড. কে. ডি. প্রসাদ

অবস্থানগত দিক থেকে দূরবর্তী যেকোনও বয়সের শিক্ষার্থীর কাছে সুবিধাজনক শর্তে (flexible) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ায় দ্রুত বিবর্তনশীল প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে এই আলোচনা। Virtual শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ভিত্তিক যোগাযোগ, প্রশ্নোত্তরভিত্তিক বেতার অনুষ্ঠানের সাহায্যে দূরশিক্ষণকে কিভাবে আরও আদান-প্রদানমূলক করা যায় সে বিষয়টিও স্থান পেয়েছে এখানে।

যেকোনও বয়সের মানুষের সামনে শিক্ষার সুযোগ এনে দিয়েছে দ্রুত বিবর্তনশীল প্রযুক্তি। এই লেখার বিষয় এটাই। প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রান্তিকতম এলাকায় বসবাসরত মানুষটির কাছেও এসংক্রান্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং প্রক্রিয়াটিকে প্রশ্নোত্তর ও আদান-প্রদান ভিত্তিক করে তোলার প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছে এখানে।

মুক্ত এবং দূরশিক্ষা (Open and Distance Learning—ODL) প্রক্রিয়াগত দিক থেকে চিরাচরিত শিক্ষণপদ্ধতি থেকে স্বাভাবিকভাবেই আলাদা। সনাতন পন্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একই জায়গায় অবস্থান করেন এবং সেখানে প্রশ্নোত্তরের সুযোগ রয়েছে। ব্যবহারিক (practical) শিক্ষণ ব্যাতীত, ODL-এ শিক্ষকের সামনে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি আবশ্যিক নয়। ফলে সেখানে প্রক্রিয়াটি একমুখী। সেজন্য মাঝ-পথেই ক্ষান্ত দেন অনেক শিক্ষার্থী। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষা ও দূরশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ভূমিকা ক্রমে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সঠিক তথ্য সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত।[১]

তথ্যসমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী ও সমাজ বর্তমান বিশ্বে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। সংযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের গুরুত্ব এখানে অবধরিতভাবেই প্রশ্নাতীত। গোটা বিষয়টিকে বলা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology—ICT)।[২] Branson (1991)-এর মতে, শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র শিক্ষকের 'থেকে' শেখেন না, শিক্ষকের 'সঙ্গে'-ও শেখেন। তা সম্ভব হয় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে। তথ্যপ্রযুক্তি হল কম্পিউটার ভিত্তিক একটি সহায়পন্থা (tool)। তথ্য ব্যবহারকারীরা ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ করেন তথ্য ভাণ্ডারকেই। প্রক্রিয়াটির একটি সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো থাকা জরুরি।[৩] স্থান অথবা সময় কিংবা সময় ও স্থান উভয় প্রশ্নেই শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের অবস্থানগত পার্থক্যের বিষয়টিকে মাথায় রেখে, মুদ্রণ বা বৈদ্যুতিন সংযোগের সাহায্যে উভমুখী আদান-প্রদান সম্ভব করে তুলে, কিছু ক্ষেত্রে মুখোমুখি আলোচনার সুযোগ রেখে তৈরি হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক শংসাসম্বলিত শিক্ষণপ্রণালী হল মুক্ত ও দূরশিক্ষা। এখানে পাঠ্য বিষয়বস্তু প্রস্তুত এবং প্রেরণের দক্ষ ব্যবস্থাপনা থাকা আবশ্যিক। মুক্ত ও দূরশিক্ষার সংজ্ঞা এভাবেই নিরূপণ করেছে Commonwealth of Learning (COL)। মূল্যায়নের বিষয়টিও স্বাভাবিকভাবেই এর সঙ্গে জড়িত।

অবস্থানগত দিক থেকে দূরবর্তী যেকোনও বয়সের শিক্ষার্থীর কাছে সুবিধাজনক শর্তে (flexible) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ায় দ্রুত বিবর্তনশীল প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে এই আলোচনা। Virtual শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার

[লেখক অধিকর্তা, ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট সেল, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি। ই-মেল : kdprasad08@gmail.com]

ভিত্তিক যোগাযোগ, প্রশ্নোত্তরভিত্তিক বেতার অনুষ্ঠানের সাহায্যে দূরশিক্ষণকে কিভাবে আরও আদান-প্রদানমূলক করা যায় সে বিষয়টিও স্থান পেয়েছে এখানে। Virtual শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলিত হন cyberspace-এ। শুরু হয় প্রশ্নোত্তরের পালা। ক্লাস শুরুর আগে স্বনির্দেশভিত্তিক পাঠের মাধ্যমে (Self Instructional Materials—SIMs) বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন শিক্ষার্থীরা। বেতার সংযোগ, তথ্যধারা (information highway), একীকৃত ডিজিটাল পরিষেবা সংযোগ ব্যবস্থা (Integrated Services Digital Networks—ISDN), মাল্টিমিডিয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ওয়েব-নির্ভর পঠনপাঠন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সামনে নিজের সুবিধামতো সময়ে তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ এনে দেয়। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্য ব্যবহারে দক্ষ হওয়া এখানে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সাধারণত এই প্রণালীতে web-এ দেওয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায় বা module-এ ঢোকেন শিক্ষার্থীরা। HTML-এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে দেওয়া থাকে এই বৈদ্যুতিন পৃষ্ঠাগুলি (hypertext pages)। এছাড়া নিয়মিতভাবে দূর আলাপ (tele-conferencing)-এর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে, যেখানে কৃত্রিম উপগ্রহ-নির্ভর একমুখী দৃশ্য-শ্রাব্য এবং দ্বিমুখী শ্রাব্য সংযোগ গড়ে তোলা হয়। অথবা বিশেষ বেতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক কথপোকথন। এইসব প্রযুক্তিগত প্রয়োগ দূরশিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় ও আদান-প্রদানমূলক করে তুলতে পারে। একইসঙ্গে অনেক বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে, চিরাচরিত শিক্ষণ পদ্ধতির মতোই দ্বিমুখী আদান-প্রদানের সুযোগ নিয়ে আসতে পারে এই পন্থা।

বস্তুত, ODL পদ্ধতির খামতিগুলি অনেকটাই মেটাতে পারে প্রযুক্তি। শিক্ষক পেয়ে যান কার্যত অফুরন্ত তথ্য ভাণ্ডার। সেইসব তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার সামনে খুলে যায় অনেকগুলি বিকল্প রাস্তা। বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ, সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার পালা শুরু হয়। ODL প্রক্রিয়ার এই পর্বগুলিকে মরিয়াম (Marriam) এবং অন্যরা[৩] বর্ণনা করেছেন সচেতনতার উন্মেষ বলে, অর্থাৎ ভ্রান্ত কিংবা পৃথক বিষয়কে চিহ্নিত করা, পরিবর্ত এবং নতুন কোনও কিছুকে খোঁজা, অন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমন্বয়ের উদ্যোগ ইত্যাদি। গোটা প্রক্রিয়াটি চলতে পারে নির্দেশাত্মক কর্মসূচি অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে।

চিরাচরিত পদ্ধতিতে শিক্ষকরা ক্লাসে যা বলেন বা দেখান সেসবকেই ওয়েব-নির্ভর পন্থায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর এই পন্থায় শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটি নৈর্ব্যক্তিক। মূল লক্ষ্য হল শিক্ষাদান এবং শিক্ষণ। সারা বিশ্ব জুড়েই এর পরিধি বিস্তৃত হতে পারে। এই পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হওয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, সমস্ত বিষয়েই তা ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে আরও বেশি মাত্রায়।[৪]

সংগঠিত এবং অসংগঠিত দু'টি পন্থাতেই শিক্ষার সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে

দেওয়ার অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মাধ্যম হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। সমগ্র বিশ্বের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, পেশাদার, বাণিজ্যিক মহলের কাছে তা অপার সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নির্দিষ্ট উৎকর্ষ মানের শিক্ষা পরিষেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে এই প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর। ODL পদ্ধতিতে কম্পিউটারের ব্যবহার শিক্ষাসংক্রান্ত নতুন কৌশলপদ্ধতি তৈরির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতাও দিয়েছে অনেকখানি। দূরভাষে শিক্ষাদান, দূর বার্তালাপ (tele-conferencing), শব্দলেখ (audio graphics), ভিডিও সম্মেলন বা কম্পিউটার-নির্ভর বার্তালাপ, মাল্টিমিডিয়া, বৈদ্যুতিন পুস্তক, অনলাইন তথ্য ভাণ্ডার ও বার্তালাপ, চাহিদাভিত্তিক পাঠক্রম, উপগ্রহ-নির্ভর যোগাযোগ, এইসব পন্থা প্রযুক্ত হয় এখানে। প্রযুক্তি-নির্ভর দূরশিক্ষা ব্যয়সাশ্রয়ীও বটে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার সমাজের সামনে অনেক দরজা খুলে দিয়েছে। কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিষেবা প্রসারের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে এই প্রযুক্তি। উৎকর্ষের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথার্থ প্রযুক্তি এবং মাধ্যম ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানও এখানে বিবেচ্য।

Haddad এবং Draxler[৫] শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগে পাঁচটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন : বক্তব্য, প্রদর্শন, অনুশীলন, পারস্পরিক বিনিময় এবং সহযোগিতা। বক্তব্য পৌঁছে দিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই ধারাগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে— মুদ্রিত বিষয়, অডিও বা ভিডিও ক্যাসেট, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, কম্পিউটার বা ইন্টারনেট। মনে রাখতে হবে যে প্রযুক্তি একটি সাধনী (tool) মাত্র। পন্থা যাই হোক না কেন, শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল অংশগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই আসল কাজ।[৬] দূরশিক্ষায় প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে দিকগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলি হল : সহজলভ্যতা, ব্যয়সাশ্রয়, গ্রহণযোগ্যতা এবং উৎকর্ষ।

ODL-এ প্রযুক্তি এবং মাধ্যমের (medium) বিভিন্ন শাখাকে ব্যবহার করা হয়। প্রফেসর বেটস[৭], [৮]-এর মতে এক্ষেত্রে ৫-টি প্রধান মাধ্যম রয়েছে, মুখোমুখি সংযোগ (face-to-face), লিখিত বিষয়বস্তু (লেখা চিত্রসমেত), শ্রাব্যসংযোগ (audio), টেলিভিশন, এবং কম্পিউটার (ইন্টারনেট, অনলাইন ইত্যাদি)। তিনি মনে করেন অপচয় ও খরচ কমাতে মাধ্যমগুলির ব্যবহার হওয়া উচিত পরিমিত। নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে একটি মাধ্যম (medium) অন্যটির চেয়ে বেশি কার্যকরী হতেই পারে। আসলে কোনও প্রযুক্তি কতটা কার্যকর তা নির্ভর করে তার ব্যবহারের ওপরে।

তথ্যপ্রযুক্তির জমানায় ২৪ ঘণ্টার যেকোনও সময়ে যেকোনও স্তরের কার্যকর এবং উচ্চমানের শিক্ষা পরিষেবা প্রদান ও গ্রহণ সম্ভব। শ্রেণিকক্ষে পড়ানোই শুধু নয়, শিক্ষকদের প্রধান কাজ এখন শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। তারা দল বেঁধে কাজ করবেন, তৈরি করবেন বিষয়ভিত্তিক পাঠ্য এবং তার পঠনপ্রণালী, সেসব পাঠাবেন এমনভাবে যাতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধায় না পড়তে হয়। বিপুল তথ্যভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় অংশটুকু পৌঁছে দেবেন শিক্ষার্থীদের কাছে। শুধু তাই নয়, মডেল প্রশ্ন ও উত্তরের পাশাপাশি হাতে আসা অন্যান্য প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়াতেও পারঙ্গম করে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের। কাজেই ধীরে ধীরে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত ও দক্ষ হয়ে উঠতে হবে শিক্ষকদেরও।

ভারতে শিক্ষা পরিষেবার উন্নয়নের কাজে চিরাচরিত পদ্ধতির যথার্থ পরিপূরক হয়ে উঠতে হবে মুক্ত ও দূরশিক্ষা ব্যবস্থাকে (ODL)। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যয়সাশ্রয়ী এবং যেকোনও প্রান্তে যেকোনও বয়সের শিক্ষার্থীর সামনে তা এনে দিতে পারে নিজের সুবিধামতো সময়ে পছন্দের বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Haag, Cummings and Dawkins. (1998). Management Information Systems for the Information age, McGraw Hill USA.

(২) Hussain, I. (2005). A Study of Emerging Technologies and their Impact on Teaching Learning Process. Allama Iqbal Open University, Pakistan.

(৩) Marriam, S. B. & Cafarella, R.S. (1997). Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide, San Francisco, Jossey-Bass Publishers.

(৪) Knowles, M.S. (1980). The Growth and Development of Adult Education in John M. Peter & Associates (eds.); Building an Effective Adult Education Enterprise, London; Jossey Bass Publishers. P. 85.

(৫) Haddad, W., & Drexler, A.A. (2002). (eds) Technologies for Education: Potentials, Parameters, and Prospect, Washington D.C.

(৬) Coble, W. (1996). Tele-learning: Deconstructing Courses. International Conference on Technology and Education, New Orleans, Louisiana, USA, March 17-20, pp. 416-18.

(৭) Bates, A.W. (1995). Technology, Open Learning and Distance Education, London: Routledge, pp. 29-31.

(৮) Bates, A.W. (1993). Interactivity as a criterion for media selection in distance education: Never Too far, 16: 5-9.

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

সাইবার নিরাপত্তা : ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ

জি. পি. পান্ডে

মানুষই হচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা শৃঙ্খলের সবচেয়ে পলকা অংশ। অ্যামেচাররা সিস্টেমকে ধসিয়ে দেয় কিন্তু প্রফেশনালরা মানুষকে চুরমার করে ফেলে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য, ডিজিটাল শিক্ষা মারফত ডিজিটাল মঞ্চ ব্যবহারে সচেতনতা গড়ে তোলাটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল সম্পদ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ভাবে ব্যবহার করার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা অত্যাবশ্যক।

আমাদের এই পৃথিবী পরস্পরের সঙ্গে খুব বেশি সংযুক্ত এবং ব্যাপক হারে ডিজিটাল। বিশ্বের ৭৬০ কোটি মতো অনলাইন আছে। আজকাল, সোশাল নেটওয়ার্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সামাজিক প্রচার মাধ্যম (social media) মানুষের সক্ষমতা বাড়িয়েছে এবং একের সঙ্গে অন্যকে যুক্ত করেছে। কিন্তু, সেইসঙ্গে, সামাজিক প্রচার মাধ্যমগুলি অবশ্যই কিছু অনিষ্টকর এবং ধ্বংসাত্মক আচরণের মঞ্চ বা প্ল্যাটফর্মও বৈকি! সামাজিক প্রচার মাধ্যম মঞ্চগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক অন্তহীন তথ্যের চ্যানেল। সাইবার অপরাধীরা তা তাদের দুষ্কর্মে কাজে লাগাচ্ছে।

আজকের এই যুগে, ডিজিটাল পরিবেশে আমাদের টিঁকে থাকার জন্য চাই দক্ষতা। ডিজিটাল সম্পদের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্ন ব্যবহারের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এই ডিজিটাল সাক্ষরতা তথ্যের তত্ত্বতালাশ, মূল্যায়ন, সৃষ্টি এবং আদানপ্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কাজে লাগাতে দড় হতে আমাদের ক্ষমতা বাড়ায়। এজন্য, তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং কারিগরি দু'ক্ষেত্রেই দক্ষতা দরকার। ছোটবেলা থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তি, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটে সড়োগড়োদের সবসময় হাতের কাছে মজুত থাকে ল্যাপটপ বা স্মার্ট ডিভাইস। কিন্তু ক্ষমতা তৈরির জন্য তারা কমপিউটার কতটা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারছে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। ধমকি, সাইবার অপরাধ, গ্রন্থস্বত্ত্ব (কপিরাইট) ইস্যু, শাসানি এবং সামাজিক অসচেতনতা ইত্যাদি বহুতর সমস্যা আছে। ডিজিটাল সাক্ষর ব্যক্তির কাছে ডিজিটাল তথ্যের অর্থাদি জানা এবং তারা তা ব্যবহার করে। এসব লোক সাংস্কৃতির এবং সামাজিক বুঝদারির লক্ষণ, সহযোগিতা, তথ্য খোঁজাখুজি ও তা বাছাই করার ক্ষমতা, কার্যকর যোগাযোগ, ই-সুরক্ষা (ইনটারনেট/অনলাইন/সাইবার সুরক্ষা), কেজো দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা এবং বিচারবিবেচনা প্রদর্শন করে। জিজিটাল দুনিয়ায় তাই আসন্ন বিপদ এড়াতে ডিজিটাল শিক্ষা অত্যাবশ্যক। ডিজিটাল জগতে সচেতনতা গড়তে তা সাহায্য করে।

২০১৬ সালটিকে গোটা বিশ্বে অনলাইন হামলার মোট ঘটনা ৭৫ কোটি ৮০ লক্ষ। সোজাসাপটা কথায়, প্রতিদিন বিশ লক্ষের মতো। এমনকী প্রকরণগতভাবে আইনসম্মত কার্যকলাপেও হরবখত ব্যক্তিমানুষের একান্ত তথ্য অপব্যবহৃত হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তা সে ছোটো বা বড়ো যাই হোক না কেন, সাইবার হানায় ভুক্তভোগী। এথেকে ফের স্পষ্ট যে সাইবার আক্রমণ সত্যিকারের, এটা কোনও মনগড়া বা অবাস্তব বিষয় নয়

[লেখক অধ্যাপক এবং ডিন, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুল অব ক্রিয়েটিভ আর্টস অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ, আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেল : gpp59aus@gmail.com]

এবং যে কোনও দিন আপনার অথবা আমার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হতে পারে। তাই, এ হানার মহড়া নিতে সচেতনতা গড়া দরকার।

Bots

সামাজিক প্রচার মাধ্যম পরিমণ্ডলে বট এবং জালিয়াত অনুগামীরা (fake followers) হচ্ছে মস্ত উদ্বেগ। অনুগামীদের টানতে, বট প্রোগ্রাম বিশেষ কিছু হ্যাশট্যাগকে নিশানা করে। এই গ্রোগাম কাজ চালায় স্বয়ংক্রিয় মন্তব্য ও স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগের মাধ্যমে। অনুগামীদের অধিকাংশই জাল বট অ্যাকাউন্ট। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিগুলি নিজেদের সক্রিয় কোনও উপস্থিতি ছাড়াই নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে পারে। গ্রাহকের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে মূলত কোম্পানিগুলির জন্য। বট কিন্তু এখন আর শুধুমাত্র সেই সাধু উদ্দেশ্যের গণ্ডীতে আটকে নেই। আকছার এর অপব্যবহার হচ্ছে।

বিশ্বের বহু মানীগুণী ব্যক্তির ট্যুইটার অনুগামীদের (Twitter followers) অর্ধেকের বেশি মেকি।[১] হ্যপা সামলানোর জন্য কোম্পানিগুলি জাল অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড বা খারিজ করে দেয়। সমস্যা কিন্তু জিইয়ে থাকে। আমরা জানতে পারি না যে 'লাইক' (like)-এ টিক মারছে কোনও বট না সত্যিকারের এক নেট ব্যবহারকারী। আদত এবং জাল প্রোফাইলের মধ্যে ফারাক ধরার উপায় অবশ্য আছে বৈকি! তবে সবসময় তা কাজে লাগানো হয় না। ভুলভাল খবর ছড়ানোর এই যুগে, বট কুমতলব নিয়ে কোনও কথাবার্তা ছিনতাই, কাউকে বিরক্ত (troll), বিশেষ মতবাদ প্রচার মায় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করার ক্ষমতা রাখে।

সন্ত্রাসী হামলা

সন্ত্রাসবাদীরা সবসময়ই চেয়েছে সকলের নজর কাড়তে এবং ঠিক সেটাই তারা পায় সামাজিক প্রচার মাধ্যম থেকে। কোনও জঙ্গি আক্রমণ হলেই, সেই আতঙ্কজনক ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে, লোকজন বিধ্বংসী হামলার ছবি এবং ভিডিও সামাজিক প্রচার

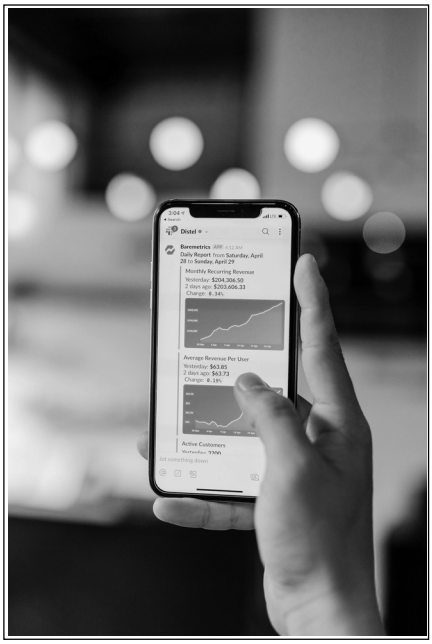

মাধ্যমে শেয়ার করে। আর এভাবেই সামাজিক মিডিয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় ত্রাস এবং নিজের অজান্তে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়। পোয়াবারো জঙ্গিদের। তারা তো এটাই চায়। ভুলভাল, রঙ চড়ানো খবর এবং ভয় পাঁচ কান হয়। জঙ্গি হানায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মানসিক বেদনা আরও বাড়ে। ভয় ডানা মেলে সাধারণ মানুষের মনে।

উগ্রপন্থীরা প্রভাব ফেলতে সামাজিক মিডিয়াকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। জঙ্গি দলে সদস্যকে ঢোকাতে, সন্ত্রাসী মতবাদ প্রচার করতে এবং যোগাযোগ রাখতেও আতঙ্কবাদীদের কাছে এ এক বড়ো অবলম্বন। এছাড়া, সন্ত্রাসের প্রভাব আরও বেশি করে ছড়ানোর জন্য তারা নিয়মিত সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের ব্যবহার করে। এতখানি প্রভাব ফেলা হয়তো জঙ্গিদের নিজেদের ক্ষমতায় কুলোত না। আর আজগুবি খবর মারফত কর্তৃপক্ষ বিভ্রান্ত করাটা তাদের বাড়তি পাওনা।

বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন (Global Risks Report)-এর কথায়, সামাজিক প্রচার মাধ্যমের ভুয়ো তথ্য, ভুলভাল খবর চটজলদি ছড়িয়ে পড়াটা এক নতুন ঝুঁকি হয়ে উঠেছে। আজগুবি সংবাদ ও গুজব সামাজিক মিডিয়ায় দাবানলের মতো বিস্তার লাভ করে এবং জঙ্গিরা তা আরও বেশি ব্যবহার করছে।

ফেসবুক, হোয়াটঅ্যাপ-এর মতো সোশাল মিডিয়া সাইটগুলি জঙ্গিদের এই কার্যকলাপ রুখতে এখন তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে। নেটে সন্ত্রাসে মদত যোগানোর কোনও বিষয় দেখলে নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীরা যাতে তা সংশ্লিষ্ট সাইট কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপত্তিকর মনে হলে সেই বিষয়বস্তু সাইট থেকে মুছে ফেলা হবে। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানেও আজকাল সাইটগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনসাধারণকে নিয়মিত ওয়াকিবহাল করার জন্য, আইন বলবৎকারী কর্তৃপক্ষ সামাজিক প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগাচ্ছে। নজির

হিসেবে, অসম পুলিশের কথা উল্লেখ্য। ওই রাজ্যের পুলিশ গুজব রটনাকারীদের গতিবিধি বা কার্যকলাপের হদিস রাখতে এবং সোশাল মিডিয়ায় নজরদারি চালাতে একটি সেল খুলেছে।

সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সংগঠিত সাইবার অপরাধ, সাইবার অপরাধ ব্যবসা, স্মিশিং (smishing—phishing with SMS), অর্থাৎ চালিয়াতি করে কমপিউটার ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য হাতানো ইত্যাদি কিছু নতুন বিপদও মাথাচাড়া দিয়েছে। ইদানীং, আর এক হামলা—ডিসট্রিবিউটেড ডিনাইয়াল অব সার্ভিস (DDoS) বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে, অনুপ্রবেশকারী আপনার তথ্য গায়েব করতে গা লাগায় না। কিন্তু, অনাবশ্যক, হাবিজাবি তথ্য কাঁড়িকাঁড়ি ঢুকিয়ে আপনার সার্ভার বসিয়ে দেয়। ভিডিও স্ট্রিমিং অ্যাপ এবং ব্যাঙ্কের অতিকায় সব সার্ভার এহেন হানার শিকার হয়। ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে এমন যে কোনও ডিভাইস (device)-এ অপরাধীরা ফাঁকফোকর তৈরি করতে পারে। ম্যালঅয়্যার লাগানো কোনও লিঙ্কে কেউ ভুলবশত ক্লিক করলে অথবা গোপনীয় তথ্য হঠাৎ জানিয়ে ফেললে, তাদের অ্যাকাউন্ট হ্যাকার ও সাইবার অপরাধীদের কাছে হাট হয়ে যায়।

মোবাইল প্রযুক্তি

শুধুমাত্র এক অতিশয় সংযুক্ত বিশ্ব নয়, আমরা এক জবরদস্ত মোবাইল দুনিয়াতেও বাস করছি। রোজকার জীবনে রকমারি অ্যাপ। আপনার স্মার্টফোন কত কত সেন্সরের ডেরা। আর সেগুলি কী কী রকম ব্যক্তিগত তথ্য হাতড়াচ্ছে তা কখনও জানলে আপনি তাজ্জব বনবেন।

আপনার ফোন থেকে জোগাড় হচ্ছে অ্যাকসেলেরোমিটার, মাইক্রোফোন, ক্যামেরা, অবস্থান, যোগাযোগ, জাইরোস্কোপ, হৃৎস্পন্দনের হার, আলো, তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, ব্যারোমিটার ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য। আপনি যেসব অ্যাপ বাবহার করেন তা থেকে আপনার স্মার্টফোন জানতে

পারে আপনি কে, আপনি কোথায় আছেন, আপনি কোথায় ছিলেন, আপনি কাদের জানেন, এখন কাদের সঙ্গে কোথায় আছেন, কী আপনি কিনেছেন, কোথায় কিনেছেন, কী খেয়েছেন, মায় এই মুহূর্তে আপনার মনমেজাজও! কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, এসব তথ্য সে কার সঙ্গে শেয়ার করছে। তৃতীয়পক্ষের অ্যাপ ডাউনলোড করলে, আপনি কি সত্যিই ওয়াকিবহাল যে আপনার খবরাখবর সংগ্রহের অধিকার আপনি বিলিয়ে দিচ্ছেন? যদি আপনার ফিটনেস অ্যাপ আপনার টেক্সট মেসেজের নাগাল পেতে চায়, তা সঠিক হবে না। হবে কি? এসব গোপন তথ্য এবং তৃতীয়পক্ষের অ্যাপ থেকে খবর যোগাড়ের মাধ্যমে কোনও হ্যাকার যদি আপনার ডিজিটাল প্রোফাইল বানায় এবং আপনার বিরুদ্ধে কাজে লাগায়, তাহলে কী হবে?

এই তো সেদিন নামজাদা এক তৃতীয়পক্ষ অ্যাপে তথ্য ফাঁস হওয়ার ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। এর ফলে, অ্যাপটির ৪৭ লক্ষ গ্রাহকের ই-মেল ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অবাঞ্ছিতদের হাতে পড়েছে। এসব তথ্য বড় মাপের ফিশিং হামলায় ব্যবহৃত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির নেটওয়ার্ক এবং ব্যবস্থাটি সংকটে পড়বে।

নয়া প্রযুক্তির এহেন আর এক চ্যালেঞ্জ হল ইনটারনেট অন থিংস (IOT)। ইন্টারনেট অব থিংসে আমরা যেসব বস্তু ব্যবহার করি তার প্রত্যেকটি সনাক্ত, অবস্থান নির্ণয়, গণনা এবং যোগাযোগ করার ক্ষমতা ধরে। এখন বস্তুর সবগুলি একে অন্যের সঙ্গে বার্তালাপ এবং তথ্য শেয়ার করলে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াবে। বলা হয় যে শিগগিরই ইনটারনেট অব থিংস ডিভাইসের সংখ্যা হবে একশো কোটি এবং তারা কথা বলবে পরস্পরের সঙ্গে। কল্পনা করুন তো, হ্যাকারদের সামনে খুলে যাবে হামলা চালানোর কী লম্বাচওড়া ময়দান! ইনটারনেট অব থিংস ডিভাইস নিয়ে সাইবার হানার সংখ্যা হবে পাহাড় প্রমাণ।

র‍্যানসমঅয়্যার (Ransomware)

এই ম্যালওয়্যার হচ্ছে এক ভাইরাস যা আপনার কম্পিউটারে ঢুকে যায়। ভাইরাসবাহী কোনও অ্যাটাচমেন্ট ডাউনলোড বা এধরনের কোনও ওয়েবসাইট খোলা এবং ক্লিক করার সময় কম্পিউটারে ভাইরাস সংক্রমণের আশংকা থাকে। একবার কম্পিউটারে সেঁধোলে, তা আপনার সব ফাইলে এনক্রিপ্ট (encript) বা ঢুকে সেসব অকেজো করে ফেলে। এসব ফাইল খোলার একটি মাত্র পথ হল মুক্তিপণ বা টাকা খেসারতের বিনিময়ে হ্যাকারের কাছ থেকে গোপন চাবি পাওয়া। এই মুক্তিপণ চোকাতে হয় বিটকয়েন দিয়ে। এর ফলে গ্রহীতার পরিচয় গোপন থেকে যায়। ২০১৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন র‍্যানসমঅয়্যারের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে ৬০০ শতাংশ। বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়, হাতপাতালে, ব্যবসা সংস্থা তো বটেই, মায় ব্যক্তিমানুষও পড়েছে এর কোপে।

তথ্যের পাহাড় (Big Data)

আমরা এখন বাস করছি উপচে পড়া তথ্যের যুগে। মাত্র ৬০ সেকেণ্ডে পাঠাতে পারি ১,৪৯,৫১৩ ই-মেল। ৩৩ লক্ষ ফেসবুক পোস্ট, ৩৮ লক্ষ গুগল সার্চ করা যায়। ইউটিউবে ভরা যায় ৫০০ ঘন্টার ভিডিও। পাঠাতে পারি ২ কোটি ৯০ লক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ। ৪,৪৮,৮০০-টি টুইট এবং লক্ষ লক্ষ অন্যান্য অনলাইন কাজকর্ম।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও, মানুষই হচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা শৃঙ্খলের সবচেয়ে পলকা অংশ (the weakest line in cyber chain)। অ্যামেচাররা সিস্টেমকে ধসিয়ে (hack) দেয় কিন্তু প্রফেশনালরা মানুষকে চুরমার (hack) করে ফেলে। যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের চেয়ে সোশাল এঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক (social engineering techniques)-কে কাজে লাগিয়ে মানুষ ঠকানো ঢের সহজ। ধোঁকাবাজদের কাছে পাসওয়ার্ড এক মস্ত মওকা। পাসওয়ার্ড যেন লখিন্দরের লোহার বাসরঘর। এর রন্ধ্র দিয়ে সেঁধিয়ে জালিয়াতরা সোশাল অ্যাকাউন্ট, মেল অ্যাকাউন্ট এবং লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ছোবল মেরেছে। ৩ কোটি ২০ লক্ষ হ্যাকড অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ করে দেখে গেছে, লোকজন প্রায়শই ঠুনকো পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে থাকে।

বর্তমান কালের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে এসব ত্রুটিবিচ্যুতির দরুন সাইবার দুনিয়ার সামনে এ এক বড়ো চোখ রাঙানি। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য, ডিজিটাল শিক্ষা মারফত ডিজিটাল মঞ্চ ব্যবহারে সচেতনতা গড়ে তোলাটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল সম্পদ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ভাবে ব্যবহার করার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা অত্যাবশ্যক।

এখন, আরও বেশি স্বচ্ছতার জন্য সরকার ক্রমশ বেশি করে ঝুঁকছে। উন্নয়ন সুস্বাগতম, তবে এর পাশাপাশি আসে নিরাপত্তহীনতার ছায়া এবং এই নিরাপত্তাহীনতার মোকাবিলা করাটা এক মস্ত মাথাব্যথার কারণ।

সাইবার হানার বিরুদ্ধে সুরক্ষাজাল

তথ্য এবং খবরাখবর শেয়ার করার জন্য চ্যানেল ও নেটওয়ার্ক মাথাগুণতিতে তো বেড়ে চলেছেই, তারা নিজেদের ক্রমবিবর্তনও অব্যাহত রেখেছে। সেইসঙ্গে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঝুঁকি। সোশাল নেটওয়ার্কে তথ্য সুরক্ষার জন্য নিচের নীতি নির্দেশিকা মেনে চলা দরকার :

(১) সোশাল নেটওয়ার্ক সাইটে তুলে ধরতে চাওয়া তথ্যের পরিমাণে লাগাম কষা।

(২) অজানা অচেনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে না তোলা।

(৩) অনলাইন খবরে অন্ধবিশ্বাস নয়; কেননা তা বিভ্রান্তকর হতে পারে।

(৪) ডিফল্ট সেটিং বদলে ফেলে, নিজের প্রয়োজনমাফিক সিস্টেম সেটিং করা ; নিজের সোশাল প্রোফাইলে সঠিকভাবে প্রাইভেসি সেটিং ব্যবহার করতে শেখা।

(৫) তৃতীয়-পক্ষ অ্যাপ্লিকেশন থেকে হুঁশিয়ার থাকা। সন্দেহজনক হলে সেই অ্যাপ্লিকেশন এড়িয়ে চলা।

(৬) নিজের সিস্টেম সুরক্ষিত করা, কেননা অসুরক্ষিত নেটওয়ার্কের দরুন আপনার ব্যক্তিগত তথ্য হাতসাফাই হতে পারে।

(৭) কম্পিউটার এবং বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি সুরক্ষিত করতে ভাইরাস প্রতিরোধী (antivirus) সফটঅয়্যার ব্যবহার করা।

(৮) আপনার অ্যাকাউন্ট এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য সহজে ধরা যায় না এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। ঘনঘন পাসওয়ার্ড বদলান।

(৯) সব সামাজিক অ্যাকাউন্টের জন্য একই পাসওয়ার্ড বসাবেন না, কেননা একটা সাইটের পাসওয়ার্ড অন্য কেউ জেনে গেলে, বাদবাকি অ্যাকাউন্ট বিপদের মুখে পড়বে।

(১০) উপযুক্ত অথেনটিকেশন স্কিম (authentication scheme) বেছে নিতে হবে; যাতে কেউ বিশদ তথ্য বসিয়ে নিতে না পারে। টু-ফ্যাকটর (two-factor) এবং মালটি-ফ্যাকটর (multi-factor) অথেনটিকেশন থাকা ভালো। টু-ফ্যাকটর অথেনটিকেশন, ইউজারনেম (username) এবং পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি আর এক ধরনের আইডেনটিফিকেশন, যা কিনা প্রায়শই 'ক্যাপচা' (captcha) ফর্মের সিকিউটিটি কোড ব্যবহার করা হয়। মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ব্যবস্থায় একাধিক পদ্ধতিতে সনাক্তকরণ করা হয়। এই সনাক্তকরণের কয়েকটি উদাহরণ— মুখমণ্ডলের ছবি, চোখের মণির ছবি, ভয়েস আইডি এবং আঙ্গুলের ছবি।

আজকের ডিজিটাল জগতে মানুষকে নেটওয়ার্ক নিরাপত্তার তাৎপর্য জানতে এবং সন্দেহমূলক কাজকর্ম চিনে নিতে হবে। তথ্য বড়ো বেশি শেয়ার করলে হ্যাকাররা ব্যক্তিগত সনাক্তকরণযোগ্য তথ্য চুরি করে নেওয়ার সুযোগ পাবে এবং তা ডার্ক ওয়েবে (dark web) বেচে দেবে।

পরিশেষ

ডিজিটাল সাক্ষরতা এক বিস্তারিত ধ্যানধারণা। সচেতনা এবং উঁচু মানের চিন্তামূলক দক্ষতা গড়তে নতুন নতুন কুশলতা ও জ্ঞানের বিকাশ এর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। ডিজিটাল তথ্য সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা দারুণ দরকার। তাই, আমাদের প্রত্যেকের দায় সাইবার পরিসরকে বিচক্ষণ এবং দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করা এবং বোঝা এবং এবিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা। তবেই সুনিশ্চিত করা যাবে যে নেটিজেনরা শুধুমাত্র প্রযুক্তি-সমঝদার এবং সমাজের সঙ্গে মানানসই নয়, ডিজিটালি নিরাপদও বটে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Twiplomacy Study : https://twiplomacy.com/

উচ্চশিক্ষায় আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

নাতাশা ঝা ভাস্কর

জনবিন্যাসের দিক থেকে ভারত সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে। এখানে কর্মক্ষম মানুষের অনুপাত বেশি। ভারত হল বিশ্বের 'তরুণতম' দেশ—গড় বয়স ২৯। বর্তমানে বিশ্বের বাকি দেশগুলি কিন্তু 'প্রবীণ' হয়ে পড়ছে। উচ্চশিক্ষার জন্য এদেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ভিনদেশ থেকে এদেশে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যার ১৫ গুণ। ভারতের জাতীয় খসড়া শিক্ষা নীতিতে গুণমানের বিচারে বিশ্বের প্রথম ২০০-টি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এদেশে শাখা খোলার আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও আলোচনায় গুণগত মান প্রাসঙ্গিকতা এবং পরবর্তীতে শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থানের প্রশ্ন অবধারিতভাবেই এসে পড়ে। শিক্ষা পরিষেবার সহজলভ্যতা, এক্ষেত্রে সমান সুযোগ, এবং খরচের বিষয়গুলিও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বিপুল যুবশক্তি এবং তার চাহিদার প্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে অধিকতর এবং ধারাবাহিক উদ্যোগ একান্তভাবে আবশ্যক।

২০২৪-২৫ নাগাদ ৫ লক্ষ কোটি (trillion) ডলার মূল্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দেশ হয়ে ওঠার স্বপ্ন রয়েছে ভারতের সামনে। তার বাস্তবায়নে প্রাথমিক শর্ত হল দেশের তরুণ-তরুণীদের বিবর্তনশীল কর্মপরিসরের উপযোগী করে তোলা। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত উৎকর্ষ, উদ্ভাবন ও ধারাবাহিক উন্নতিসাধনের পথে হাঁটতেই হবে তাদের। দেশের খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতিতে উচ্চশিক্ষায় যোগদান অনুপাত (Gross Enrolment Ratio—GER) ২০৩৫-এর মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তা সম্ভব হলে বিশ্বের প্রতি স্নাতকের মধ্যে একজন হবেন ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উত্তীর্ণ। বর্তমানে GER হল ২৬.৩ শতাংশ। আগামী ১৫ বছরে তা দ্বিগুণ করতে হলে দরকার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের বর্তমান GER সারা বিশ্বের গড়, ৩৬.৭ শতাংশের চেয়ে অনেকটাই নিচে।

উচ্চ শিক্ষা : ভারতের সামনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়

জনবিন্যাসের দিক থেকে ভারত সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে। এখানে কর্মক্ষম মানুষের অনুপাত বেশি। ভারত হল বিশ্বের 'তরুণতম' দেশ—গড় বয়স ২৯। বর্তমানে বিশ্বের বাকি দেশগুলি কিন্তু 'প্রবীণ' হয়ে পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত গোষ্ঠীর গড় বয়স চল্লিশ। পশ্চিম ইউরোপে তা ৪৬, জাপানে ৪৭। কাজেই, অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর মতো যুবশক্তি থাকার পাশাপাশি দক্ষ কর্মীর সংখ্যার নিরিখে সারা

[লেখক জেনারেল ম্যানেজার, কর্পোরেট অ্যাডভাইসারি ফার্ম 'নিউল্যান্ড গ্লোবাল গ্রুপ'। ই-মেল : natashajhabhaskar@gmail.com]

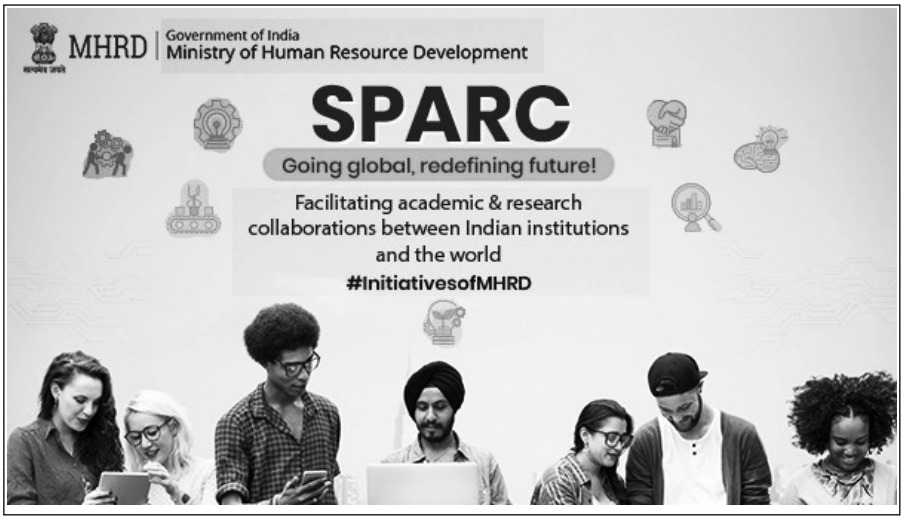

বিশ্বের প্রধানতম কেন্দ্রও হয়ে উঠতে পারে এই দেশ। এই সুবিধা আবার অন্য দিক থেকে একটি চ্যালেঞ্জও এনে দেয়। যুব সমাজকে আরও প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে তুলতেই হবে। সেজন্য তৈরি করতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা।

উচ্চশিক্ষার চালচিত্রে বাজারের একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। ভারতের ৯৯৩-টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৩৯ শতাংশ বেসরকারি ব্যবস্থার আওতায়। ৩৯,৯৩১-টি মহাবিদ্যালয়ের ৭৮ শতাংশ বেসরকারি (সহায়তাপ্রাপ্ত এবং সহায়তাপ্রাপ্ত নয়—দু'রকম ধরে)। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ৬৬.৪ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঠরত রয়েছেন বেসরকারি কলেজগুলিতে। অর্থাৎ, মোট যে ২২ শতাংশ সরকারি কলেজ রয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীর ভিড় অনুপাতের হিসেবে অনেক বেশি। এদের অনেকেই আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে অপারগ।[১]

মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমে বাড়ছে। সেজন্য, শিক্ষা পরিষেবার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের অবস্থার ফারাক এখন অনেক প্রকট। উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের ৫৪ শতাংশের বেশি উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং কর্ণাটক—এই ৫-টি রাজ্যের। দেশের মোট ৩৯,৯৩১-টি কলেজের ৩২ শতাংশেরও বেশি রয়েছে ৫০-টি জেলায় (ভারতে জেলার সংখ্যা ৭৩১)। মহাবিদ্যালয় ঘনত্ব (ভর্তি হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতি হাজার শিক্ষার্থীপিছু কলেজের সংখ্যা) সার্বিকভাবে গোটা দেশে ২৮ হলেও রাজ্যে রাজ্যে ফারাক অত্যন্ত বেশি। অনুপাতটি বিহারে সাত, কর্ণাটকে তিপান্ন। পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ ব্যয় অর্থাৎ opportunity cost (যাতায়াত, হস্টেলের খরচ) প্রায়শই অত্যধিক—যা শিক্ষাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

স্নাতকদের মধ্যে নিয়োগযোগ্যের অনুপাত কম হওয়া (low employability); বহুক্ষেত্রেই শিক্ষাদানে গুণগত উৎকর্ষের অভাব, অদক্ষ প্রশাসন, অর্থসংস্থানের অপ্রতুলতা, এবং জটিল নিয়ন্ত্রণবিধি ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের বড়ো সমস্যা। অন্য দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে অনেক সময়েই উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষের সূচক ধরা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯-এ ওই সংখ্যাটি ছিল মাত্র ৪৭,৪২৭। অথচ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫০-এরও বেশি।[২] চিনে অন্য দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার লক্ষের বেশি। জার্মানিতে সংখ্যাটি তিন লক্ষের বেশি। সিঙ্গাপুরে সংখ্যাটি ৭৫,০০০। সারা বিশ্বের হিসেব ধরলে, ভারতে ভিনদেশি শিক্ষার্থীর অনুপাত এক শতাংশেরও কম। নামীদামি সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক ক্রমতালিকাগুলিতে গুণগত উৎকর্ষের বিচারে বিশ্বের প্রথম ১০০-টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নেই কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। আর, উচ্চশিক্ষার জন্য এদেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ভিনদেশ থেকে এদেশে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যার ১৫ গুণ।

বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা

ভারতের জাতীয় খসড়া শিক্ষা নীতিতে গুণমানের বিচারে বিশ্বের প্রথম ২০০-টি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এদেশে শাখা খোলার আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তৈরি করেছে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা EQUIP (Education Quality Upgradation and Inclusion Programme) (শিক্ষাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি)/ ভিনদেশি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে কয়েকটি নির্বাচিত শহর—বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, পুনে, চণ্ডীগড় এবং সিকিমের অংশবিশেষে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)-এর ধাঁচে স্বতন্ত্র শিক্ষা অঞ্চল (Exclusive Education Zone—EEZ) গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করেছে নীতি আয়োগ।

পেশাগত নিয়োগ যোগ্যতা এবং সামাজিক সোপানে এগিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি হল শিক্ষা। সেজন্যই উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত সমাজ পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠছে। ভারতের জনবিন্যাসগত সুবিধাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত উপযুক্ত ও দক্ষ শিক্ষা পরিষেবার সংস্থান। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। একথাই প্রতিফলিত হয়েছে নীতি আয়োগ কিংবা এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার বক্তব্যে।

ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নতিসাধন এবং এখানেই প্রয়োজনে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উৎকৃষ্টতর পাঠক্রম পরিষেবার সংস্থানের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়টি এখন আলোচিত হচ্ছে গুরুত্বের সঙ্গে।

নিবিড় সংযোগের সুযোগ

শিক্ষা পরিষেবার বিষয়টি অস্ট্রেলিয়ার রপ্তানি ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ওই দেশের সঙ্গে ভারতের শিক্ষা সংক্রান্ত অংশীদারিত্ব খুবই কার্যকর হতে পারে। ২০১৪ সালের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পঠনরত ভারতীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১

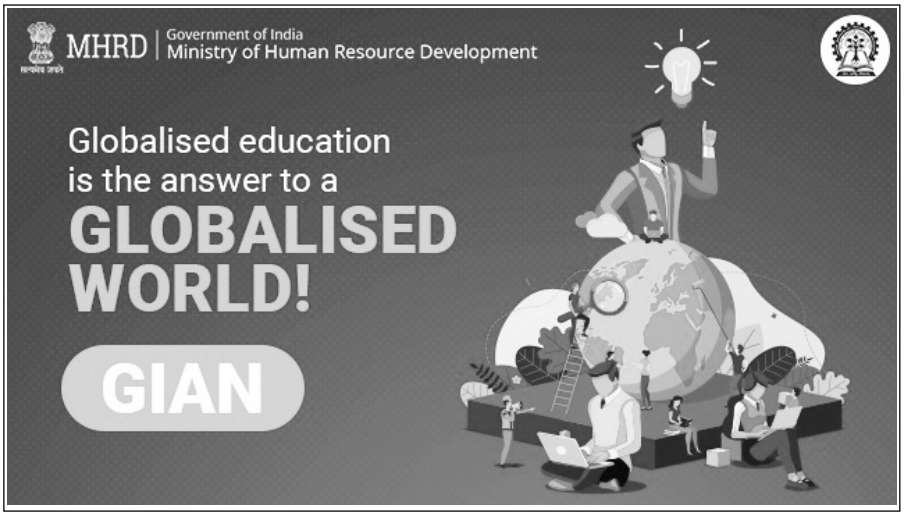

শতাংশ বেড়েছে। ২০১৯ সালে ওই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হয়েছেন ১,০৭,৬৭৩ জন।[৩] অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত অন্য দেশগুলির শিক্ষার্থীর ১৫ শতাংশ ভারতীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের পর ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে পছন্দের গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু, অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষার্থীদের পাঠিয়ে দেওয়ার যে চল বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তা একইভাবে বেশিদিন টেকা সম্ভব নয়। বরং ওইসব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মতো ব্যবস্থাপনা তৈরির রাস্তায় হাঁটলে আগামী দিনে সুফল মিলবে।[৪] বিভিন্ন ধরনের পাঠদানের পরিষেবা সম্বলিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Higher Education Institution—HEI) -এর সঙ্গে শিল্পমহলের সংযোগ শিক্ষার্থীদের কাজের বাজারের উপযোগী করে তোলার সহায়ক। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের (Tier 2 and 3) শহরগুলিতে এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশ্বমানের শিক্ষা সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশেষ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। তা সম্ভব হলে এদেশের আরও বেশি শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক স্তরের নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা পেতে পারবেন।

যৌথ আদান-প্রদান ও শিক্ষামূলক ভ্রমণ, গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎকর্ষের ক্রমতালিকায় এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্বনামধন্য বিদেশি শিক্ষাবিদদের স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে এদেশে এনে গবেষণা ও শিক্ষাদানের কাজে লাগাতে চাইছে সরকার।

শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংযোগ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ (Global Initiative of Academic Networks (GIAN)-এর আওতায় এদেশে নির্বাচিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা প্রসার প্রকল্প বা Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration—SPARC-এর বিষয়টিও এখানে উল্লেখ্য। কিন্তু, সমস্যার বিষয় হল এই যে ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্র সম্পর্কে বিশেষ কোনও ধারণার অভাবে, বিশেষত নিয়ন্ত্রণমূলক রীতিগুলির ব্যাপারে সংশয়ের কারণে সাময়িক ভিত্তিতে এদেশে পড়ানোর উদ্যোগে সামিল হতে চান না ভিনদেশের বহু শিক্ষক।

দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত চিত্রপট। বিচ্ছিন্নভাবে নয় সার্বিক এবং পরিকল্পনামাফিক অংশীদারিত্ব এই সময়ের দাবি। উদাহরণ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার কথাই ধরা যাক। খনি নিরাপত্তা, জৈব ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল প্রসেসিং, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা (cyber security) জলবায়ু পরিবর্তন-এর মতো বিষয়ে ওইসব দেশ এগিয়ে। ভারতও এগোতে চায়। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত কার্যকর হয়ে উঠবে।

২০০৫-এর পরে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গেছে। তা সত্ত্বেও সেখানে ভারত সম্পর্কে অজ্ঞতা এখনও বেশি। ১৯৯৬-এ অস্ট্রেলিয়ার ৬-টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা পড়ানো হ'ত। এখন হয় মাত্র দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৫] এই অবস্থা পালটাতে দরকার পরস্পরের সংস্কৃতি ও অন্যান্য পরিমণ্ডল সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তবেই শিক্ষা সংক্রান্ত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার হবে।

একাজে আরও গতি আনবে ইংরেজি ভাষার শিক্ষার প্রসার। প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশ্নে আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (RUSA)-র মতো সরকারি উদ্যোগ দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান আরও ব্যাপকতর করে তুলবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে ২০২২-এর মধ্যে এদেশের আরও চল্লিশ কোটি কর্মীকে অধিকতর দক্ষ করে তোলা সম্ভব। খুঁজে নিতে হবে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি। অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের খরচ এবং লাভের দিকটিও খতিয়ে দেখতে হবে তুল্যমূল্য বিচার করে।

নীতি সংক্রান্ত আলোচনা, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অংশীদারিত্ব, গবেষণা সহযোগিতার ভিত্তিতে আদান-প্রদানের পথে এগোলে আদতে লাভ হবে দু'তরফেরই।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) http://aishe.nic.in/aishe/viewDocument.action?documentId=262 (accessed on 8 January, 2020).

(২) https://www.orfonline.org/expert-speak/increasing-enrolment-in-higher-education-a-quantitative-and-qualitative-challenge-55883/ (accessed on 8 January, 2020).

(৩) https://ministers.education.gov.au/tehan/growing-engagement-between-australia-and-india (accessed on 8 January, 2020).

(৪) https://www.afr.com/policy/health-and-education/australia-s-education-approach-to-india-not-sustainable-20190428-p51i0c (accessed on 8 January, 2020).

(৫) https://theconversation.com/how-australia-can-help-reform-higher-education-in-india-88479 (accessed on 8 January, 2020).

হোমস্টে-র মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জীবিকা সংস্থান

ড. রত্না ভুয়ান

গ্রামীণ হোমস্টে-র সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়াসের আগে, বিশেষত পাহাড়ি রাজ্য ও বনাঞ্চলে, বাস্তুতন্ত্রের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। নীতি নির্ধারণ এবং তা রূপায়ণের কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়নে সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। সঠিক নীতি ও কৌশল অবলম্বন করলে গ্রামীণ এলাকার হোমস্টেগুলি গ্রামীণ উদ্যোগ গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রথাগত শিল্প, সংস্কৃতি, খাদ্য, সংগীত প্রভৃতির প্রসারে বিশেষ সহায়ক হবে। গ্রামীণ হোমস্টেগুলি একটি নির্দিষ্ট মানে আনা এবং তাদের গুচ্ছভিত্তিক উন্নয়ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হোমস্টে-কে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে। এই অঞ্চলকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে এবং গ্রামীণ হোমস্টে শিল্পকে এখানে প্রসারিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে ও নীতি প্রণয়ন করছে, তার পর্যালোচনা করা হল এই নিবন্ধে।

হোমস্টে-র মাধ্যমে কীভাবে জীবিকার সংস্থান করা যায় তা জানতে অরুণচল প্রদেশের ২১ জন মহিলা গুয়াহাটিতে গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj—NIRDPR) উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্রে এক মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স করলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন একটি স্বশাসিত সংগঠন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে হোমস্টে-র প্রসার ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে পর্যটক আকর্ষণ করাই হল এই সার্টিফিকেট কোর্স চালুর মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে শুধু যে পরিবার ও গোষ্ঠীর আয় বাড়বে তাই নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ওই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দরজাটাও খুলে যাবে। NIRDPR যেভাবে তাদের প্রথম প্রয়াসেই অরুণাচলের প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রাম থেকে এইসব মহিলাদের নিয়ে এসে হোমস্টে শিল্পের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তা এক নীরব নারী বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। আন্তরিক আতিথেয়তার সঙ্গে ঐতিহ্যের মিশেলে হোমস্টে ক্রমশ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই ২১ জন মহিলার সামনে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। অরুণাচল রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন এই মহিলাদের চিহ্নিত করেছে। এদের জীবনে মিশন আলোকবর্তিকার ভূমিকা নিয়েছে। কাজটা কিন্তু যথেষ্ট কঠিন ছিল। গ্রামীণ হোমস্টে-র ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে এই মহিলাদের সেই বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে অরুণাচল রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। প্রয়োজনীয় সব রকমের সাহায্য করেছে মিশন। এখন এই হোমস্টে-র বৈপ্লবিক ধারণা যাতে অরুণাচল প্রদেশে সুস্থিত ধারাবাহিকতা অর্জন করতে পারে, সেজন্য মিশনকে ব্যক্তিভিত্তিক স্তরে কাজ করতে হবে অথবা গোষ্ঠীগত সহায়তা নিতে হবে।

হোমস্টেগুলির সুযোগসুবিধা যাতে একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছয়, সেজন্য ২০০৬ সালে পর্যটন মন্ত্রক একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। পরবর্তীকালে এর নানাবিধ সংশোধন হলেও মূল নির্দেশিকার নির্যাস আজও অক্ষুণ্ণ। ভারতে কোনও হোমস্টে-কে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে হলে সেটিকে

[লেখক সহকারি অধ্যাপক, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব রুরাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েতি রাজ (NIRDPR), নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওনাল সেন্টার, গুয়াহাটি। ই-মেল : ratnabhuyan.nird@gov.in]

Incredible India Bed & Breakfast/ Homestay Establishments-এর নির্দেশিকা মেনে নথিবদ্ধ ও অনুমোদিত হতে হবে। পর্যটন মন্ত্রকের অনুমোদন পাবার পর সেই হোমস্টে-কে শংসাপত্র দেওয়া হবে। সুযোগসুবিধা ও পরিষেবার তারতম্য অনুসারে হোমস্টেগুলিকে গোল্ড ও সিলভার, এই দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। নির্দিষ্ট মাপকাঠির একটি তালিকা আছে। তার নিরিখে দু'টি স্তরের মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেসব হোমস্টেতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রথাগত গৃহসজ্জা থাকে এবং অতিথিদের রসনাতৃপ্তির জন্য সেই অঞ্চলের বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলিকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই নির্দেশিকাগুলি সারা ভারতেই প্রযোজ্য এবং এগুলি অভিন্ন জাতীয় মানের স্বাক্ষর বহন করে।

তবে এই নির্দেশিকার ভিত্তিতে উত্তর-পূর্বের হোমস্টেগুলির শ্রেণি বিভাজন অত্যন্ত কঠিন। তালিকায় যে ৩৬-টি মাপকাঠি রয়েছে, তা পালন করা উত্তর-পূর্বের গ্রামাঞ্চলের হোমস্টেগুলির পক্ষে বেশ অসুবিধাজনক। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি চাইলে তাদের সুবিধামতো এই তালিকা পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে পারে, তবে মূল নীতিগুলি অপরিবর্তিত থাকতে হবে। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড, পর্যটকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেখানে কুলু, সিমলা, চাম্বা, সোলান, নন্দা দেবী, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস প্রভৃতি জায়গায় বহু হোমস্টে গড়ে উঠেছে। সেগুলি পর্যটন দপ্তরে নথিভুক্ত। দক্ষিণের দিকে কেরল, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুতেও বেশকিছু হোমস্টে দেখা যায়। কেরলে আলাপ্পুঝা. কুমারাকম, কলাগাপ্পারা ও মানান্থাভাডিতে তো হোমস্টে বেশ সাড়া জাগানো ব্যবসা। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে হোমস্টে মূলত বাগিচাগুলিকে ঘিরে গড়ে ওঠে। কেরলে হোমস্টে অ্যান্ড ট্যুরিজম সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি হোমস্টে যাতে পরিবেশ-বান্ধব হয় এবং সোসাইটির নিয়মকানুন মেনে চলে, সেদিকে কড়া নজর রাখে তারা। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে ডুয়ার্সে এবং ভুটানের আশপাশে ২০১৫ সালের হিসাবমতো শতাধিক হোমস্টে রয়েছে। ওড়িশাও পর্যটকদের প্রিয় একটি রাজ্য। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকার পরিমার্জন ঘটিয়ে হোমস্টে-র অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এপর্যন্ত ৫০-টি অনুমোদিত হোমস্টে রয়েছে, এগুলির বেশিরভাগই ভুবনেশ্বর ও তার আশপাশের এলাকায়। এখন প্রশ্ন হল, এই নির্দেশিকাগুলি কি যথেষ্ট?

নীতি নির্ধারণ এবং তা রূপায়ণের কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়নে সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। সঠিক নীতি ও কৌশল অবলম্বন করলে গ্রামীণ এলাকার হোমস্টেগুলি গ্রামীণ উদ্যোগ গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রথাগত শিল্প, সংস্কৃতি, খাদ্য, সংগীত প্রভৃতির প্রসারে বিশেষ সহায়ক হবে। এজন্য সব থেকে আগে গ্রামীণ পর্যটনস্থলগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর সেইসব এলাকার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির দক্ষতা বাড়াতে হবে, যাতে তারা হোমস্টে চালানোর উপযোগী হয়ে ওঠেন। এই দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, এজন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ ও অংশীদারকে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং, মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি, অসমের কাজিরাঙ্গার মতো বিচ্ছিন্ন কয়েকটি এলাকা ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলে

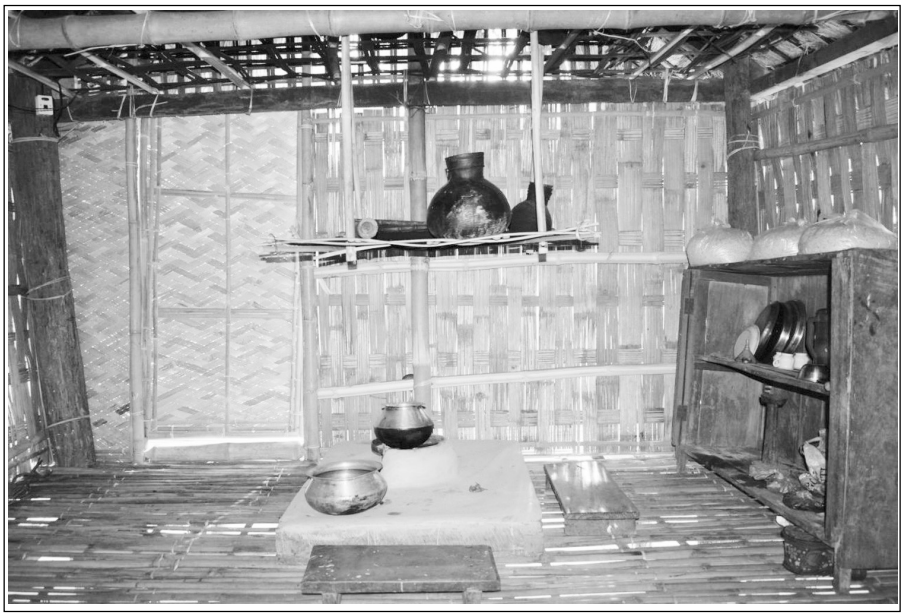

হোমস্টের প্রচলন এখনও সেভাবে হয়নি। এগুলিও মাস ছয়েকের মধ্যে গড়ে উঠেছে। বিপুল পর্যটক সমাগমে উৎসাহিত হয়ে সিকিমের পঞ্চায়েতি রাজ দপ্তর পশ্চিম সিকিমের গেজিং-এর মতো কয়েকটি জায়গায় পর্যটক আবাস গড়ে তুলেছে। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যত্র ছবিটা একেবারেই ভিন্ন। পূর্ব ভারতের অন্নপাত্র হিসাবে খ্যাত নিম্ন সুবানসিরি জেলার জিরো ভ্যালি, চিন সীমান্তে পশ্চিম সিয়াং জেলার মেচুকা ভ্যালির (যেখানে মূলত সেনারা থাকেন) মতো কয়েকটি জায়গা বাদ দিলে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং, উচ্চ সিয়াং, পূর্ব কামেং জেলাগুলিতে পর্যটক সমাগম প্রায় হয় না বললেই চলে। এই প্রেক্ষাপটে ২০১২ সালে WWF India, ভারত সরকারের UNDP-এর সহায়তায় অরুণাচল প্রদেশের জন্য হোমস্টে নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে। সেখানে হোমস্টে-সহ গোষ্ঠীভিত্তিক পর্যটন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তরের অধীনে গ্রাম পর্যটন ব্যবস্থাপনা কমিটি (Village Tourism Management Committee—VTMC) গঠন করার সুপারিশ করা হয়।

গ্রামীণ হোমস্টে-র সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়াসের আগে, বিশেষত পাহাড়ি রাজ্য ও বনাঞ্চলে, বাস্তুতন্ত্রের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। হোমস্টে পর্যটনকে বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে, কারণ এই দু'টির মধ্যে একধরনের কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। উত্তর-পূর্বের অরণ্যচারী প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রা পালটে দেওয়ার ক্ষমতা হোমস্টে শিল্পের রয়েছে। তবে এজন্য যৌথ অরণ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং পরিবেশ উন্নয়ন কমিটিগুলিকে সঙ্গে নিতে হবে। তাদের সহায়তা পেলে গ্রামীণ হোমস্টে এক অর্থকরী জীবিকার উৎস হয়ে উঠতে পারে। হোমস্টে পর্যটনের প্রসার হলে অরণ্যসম্পদের ওপর এই প্রান্তিক মানুষগুলির নির্ভরতা কমবে এবং তার পাশাপাশি এই গোষ্ঠীগুলি, পর্যটক এবং আদিম উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মধ্যে একটা প্রতীকী সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর একটা বিষয় হল, কাঠ ছাড়া অন্যান্য অরণ্যসম্পদ বিক্রির সুসংগঠিত বাজার না থাকায় প্রায়শই ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। পর্যটকরা এলে সেগুলি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সঠিক দামে বিক্রি করা সম্ভব হবে। উদাহরণ হিসাবে শালপাতার থালার কথা বলা যায়। উপযুক্ত বাজার পেলে এগুলি প্লাস্টিকের পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে হোমস্টেগুলিরও ভূমিকা রয়েছে। তাদের মধ্যে পরিবেশ-বান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করার সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

উত্তর-পূর্বের গ্রামীণ হোমস্টে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে গেলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রগত আশঙ্কা এবং প্রাকৃতিক খামখেয়ালিপনার কথাও মাথায় রাখতে হবে। গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে প্রাকৃতিক ঝুঁকির কথা। উত্তর-পূর্বে বর্ষা দীর্ঘদিন ধরে চলে, তাই পর্যটন এখানে মরসুমি। সেজন্য হোমস্টে-তে পর্যটক আসবে বছরে মাত্র চার-পাঁচ মাস, অন্য সময়ে সেগুলো খালিই পড়ে থাকবে। ফলে এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেড়ে যায়। বিনিয়োগের ওপর লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও এই ক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহী হবে না। এই প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। যেকোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিকল্প পরিকল্পনা মজুত রাখা প্রয়োজন। এজন্য হোমস্টে ব্যবস্থাপনা,

পরিবেশ-বান্ধব সাজসজ্জা এবং আতিথেয়তা ও পরিষেবা ক্ষেত্রের ব্যবসায়িক মডেলের এক সুসমন্বিত প্যাকেজ গড়ে তোলা দরকার। সেইসঙ্গে হোমস্টেগুলির বিকাশের জন্য অন্তত এক থেকে দু' বছর সময় দিতে হবে, অর্থাৎ এই সময়ে কোনও লাভের প্রত্যাশা না করেই মূলধনী বিনিয়োগ করে যেতে হবে। এক্ষেত্রে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বেসরকারি অংশীদারিত্ব নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

এই অঞ্চলকে পর্যটন গন্তব্য করে তুলতে হলে সংযোগ ও যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে, থাকতে হবে সুদৃঢ় সরবরাহ ব্যবস্থা। ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইডদের মতো ব্যবসায়িক উন্নয়ন পরিষেবাদাতাদের সুবিধার দিকে নজর রাখার পাশাপাশি উচ্চমানের আতিথেয়তা ও ব্যাপক প্রচারের ওপর জোর দিতে হবে। বিভিন্ন মন্ত্রকের নেওয়া কর্মসূচিতে বিচ্ছিন্নভাবে

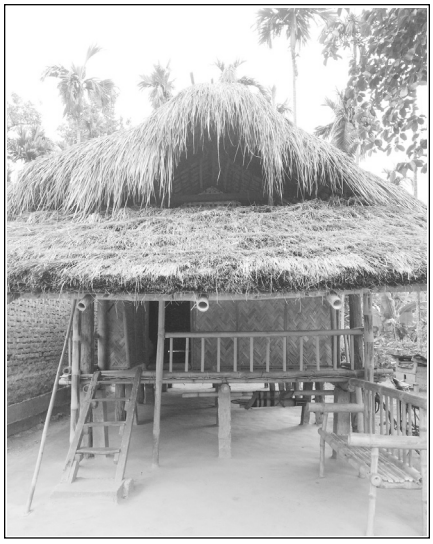

হোমস্টে-র উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এতে কাজের কাজ হবে না। পর্যটকদের হোমস্টে-র প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে সুসংহত পরিকল্পনা দরকার, সেইসঙ্গে তারা যাতে বাইরে এসেও বাড়ির মতো উষ্ণতা ও আন্তরিকতার স্বাদ পান, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার গ্রামীণ হোমস্টে পর্যটনের প্রসারে যেসব নীতি নিয়েছে, সেগুলি সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা, তাও দেখতে হবে। নির্দিষ্ট অঞ্চল বেছে নিয়ে, সেখানকার হোমস্টেগুলি কতজন পর্যটক রাখতে পারে এবং কতজন পর্যটক সেখানে থাকলেন, এই দুইয়ের অনুপাতের ভিত্তিতে এর মূল্যায়ন করা সম্ভব।

গ্রামীণ হোমস্টে-এর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। ভারতে মোবাইল ডেটা ও স্মার্টফোনের অনুপাত বিশ্বে সর্বাধিক। বিশ্বের অগ্রণী আতিথেয়তা পরিষেবাদানকারীদের সঙ্গে কীভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়, তাও খতিয়ে দেখতে হবে। বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশ ও অসমের সামান্য কয়েকটি হোমস্টে এই পরিষেবা প্রদানকারীদের স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অরুণাচলের আলো ও রোয়িং এবং অসমের ডিমো ও ঢেকিয়াজুলিন এলাকার কয়েকটি হোমস্টে। অথচ অরুণাচলে বর্তমানে হোমস্টে-র সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তাওয়াং-এ ১৭-টি, পূর্ব সিয়াং-এ ১০-টি, নিম্ন সুবানসিরিতে ২৪-টি, পশ্চিম সিয়াং-এ ১২-টি, পূর্ব কামেং-এ ২-টি এবং পশ্চিম কামেং-এ ১১-টি হোমস্টে রয়েছে।

রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায় হোমস্টে-কে কৃষি বহির্ভূত সুস্থিত জীবিকার স্বীকৃতি দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার ব্যবস্থা করা যায়। সংশ্লিষ্ট রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিয়োগের জন্য বেসরকারি অংশীদারদের সঙ্গে বিনিয়োগের সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষরও করতে পারে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে জেলা স্তরে একটি সমন্বয় বা পরামর্শদাতা কমিটি গড়ে তোলা যেতে পারে। ডেপুটি কমিশনারের পৌরোহিত্যে এই কমিটিতে জেলা পর্যটন আধিকারিক, জেলা শিল্প আধিকারিক, আঞ্চলিক/গ্রাম পঞ্চায়েত/গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের প্রতিনিধিরা, জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রমুখ এই কমিটিতে থাকবেন। এছাড়া যে এলাকায় ওই হোমস্টে-টি রয়েছে, সেখানকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরও কয়েকজনকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অরুণাচল প্রদেশের কেবাং-এ যেমন সেখানকার প্রথাগত সংস্কৃতির প্রতিনিধিদের নেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তর, হোমস্টে-টি বনাঞ্চলে হলে বন বিভাগ, হস্তশিল্প সংগঠন, সীমান্ত সড়ক সংস্থা প্রভৃতির প্রতিনিধিদেরও এই কমিটিতে রাখা যায়। National Institute of Rural Development and Panchayati Raj—NIRDPR এবং রাজ্যভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরাও এখানে থাকতে পারেন।

গ্রামীণ হোমস্টেগুলি একটি নির্দিষ্ট মানে আনা এবং তাদের গুচ্ছভিত্তিক উন্নয়ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হোমস্টে-কে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে। ঠিক যেমনটা দেখা গেছে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং ও জিরোতে। যে ২১ জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিলেন, তাদের আমরা সম্ভাব্য হোমস্টে উদ্যোগী বলতে পারি। তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হল সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে গ্রামীণ হোমস্টে আন্দোলনে শামিল করা। এজন্য সুসমন্বিত সার্বিক প্রয়াস প্রয়োজন।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Gangotia, A. (2013). Home Stay Scheme in Himachal Pradesh: A Successful Story of Community Based Tourism Initiatives (CBTIS). Global Research Analysis, Vol.2, Issue 2.

(২) Macek, I.C. (2012). Homestays as Livelihood Strategies in Rural Economies: The Case of Johar Valley, Uttarakhand, India. Thesis submitted to University of Washington, Washington.

প্রকাশন বিভাগের যেকোনও পত্রিকা সম্বন্ধে অভিযোগ থাকলে helpdesk1.dpd@gmail.com-এ ই-মেল মারফত জানান। যোজনা (বাংলা)-র পাঠকরা subscription.yojanabengali@gmail.com-এও যোগাযোগ করতে পারেন।

সমাজের দুর্বলতর তথা বঞ্চিত বর্গের মানুষের জন্য উচ্চমানের শিক্ষা

সংকলন : যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী

শিশুদের জন্য নিখরচার তথা বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন, যার পোশাকি নাম, Right to Education Act, 2009 বা শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ বলবৎ হওয়ার সৌজন্যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা হয়। এর ফলে দেশের ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত বাচ্চা নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে ভর্তি হয়ে বিনা পয়সায় বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করার হকদার হয়ে ওঠে। সমাজের দুর্বলতর বর্গ তথা বঞ্চিত শ্রেণিভুক্ত কোনও বাচ্চা যেন তার বুনিয়াদি স্তরের স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করার প্রশ্নে কোনও পরিস্থিতিতেই কোনওরকম বৈষম্যের শিকার না হয় বা প্রতিবন্ধকতার মুখে না পড়ে সংশ্লিষ্ট সরকারকে তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে উল্লিখিত আইনে ধারা ৮(সি)-তে। এছাড়াও ওই আইনের ১২(১)(সি) ধারায় বলা হয়েছে, সমস্ত বিশেষ শ্রেণিভুক্ত এবং সরকারি অর্থ সহায়তাপুষ্ট নয় এমন স্কুল, এককথায় বেসরকারি স্কুলগুলিকেও তাদের আশপাশের এলাকাবাসী কমজোর বর্গ এবং বঞ্চিত শ্রেণিভুক্ত শিশুদেরকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করতে হবে এবং ওই শ্রেণিকক্ষের অন্তত ২৫ শতাংশ বাচ্চা হবে উল্লিখিত গোত্রের। প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুল শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদেরকে বিনা পয়সায় ওই স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

● **প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে গৃহীত পদক্ষেপ :** সমগ্র শিক্ষা হল স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য এক বিশেষ কর্মসূচি। যার আওতায় আসছে প্রাক্-বিদ্যালয় থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণি। উদ্দেশ্য, স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্ত স্তর জুড়ে গুণগত দিক থেকে উৎকৃষ্ট সমমানের শিক্ষার প্রসার সুনিশ্চিত করা। এই কর্মসূচির ধ্যানধারণায়, 'স্কুল' হল এক ধারাবাহিকতা, প্রাক্-বিদ্যালয় থেকে যার সূচনা এবং প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক পেরিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এর বিস্তার। স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রের সর্ব স্তরে থেকে লিঙ্গ বৈষম্য এবং সামাজিক ভেদাভেদজনিত ফারাক ঘোচানোটাও উল্লিখিত কর্মসূচির এক বড়ো উদ্দেশ্য। যে কারণে, কন্যাসন্তান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠী তথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বাচ্চা এবং রূপান্তরিত লিঙ্গের পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচির আওতায়। শিক্ষার অধিকার আইনে থাকা সংস্থানগুলিকে ভিত্তি করেই সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের রূপরেখা স্থির করা হয়েছে। পড়ুয়াদের বিনা পয়সায় স্কুলের পোশাক, ও পাঠ্যপুস্তক প্রদান তথা স্কুল-ছুট বাচ্চাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণদান ইত্যাদি। এছাড়াও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সার্বিক শিক্ষার বন্দোবস্ত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি এই কর্মসূচিতে শামিল করা হয়েছে।

"**পড়ে ভারত বাঢ়ে ভারত**" ছিল সাবেক ''সর্ব শিক্ষা অভিযান'' কর্মসূচির এক উপ-প্রকল্প। বর্তমানে তা নয়া সংহত কর্মসূচি, সমগ্র শিক্ষার আওতায়, স্কুল শিক্ষার বুনিয়াদি বছরগুলিতে উৎকৃষ্ট গুণমানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে চালু রয়েছে। খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে একেবারে শুরু থেকেই লিখতে-পড়তে পারার অভ্যাস গঠন, বোধগম্যতার বিকাশ, সংখ্যা জ্ঞানে দড় করে তোলা ইত্যাদি হল এই প্রকল্পের বিবিধ উদ্দেশ্য। নিজ নিজ রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে "পড়ে ভারত বাঢ়ে ভারত" প্রকল্প রূপায়িত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপর ন্যস্ত। এজন্য তারা প্রয়োজনমাফিক বিবিধ রণকৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে। স্কুল শিক্ষার সূচনা লগ্নেই পড়তে সড়োগড়ো হতে NCERT মডেল অনুসরণ, অনুপূরক পাঠ্যসামগ্রীর সংস্থান তথা খুদে পড়ুয়াদের সংখ্যা জ্ঞান/অঙ্ক জ্ঞান ও পাঠে সড়োগড়ো করে তুলতে রাজ্য বিশেষে সুনির্দিষ্ট মডেলের তৈরি ইত্যাদি উল্লিখিত উদ্যোগের উদাহরণ।

নবোদয় বিদ্যালয় প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংস্থান করা হয়েছে। যাতে করে গ্রামাঞ্চল থেকে সেরা মানের মেধা/প্রতিভা তুলে আনা সম্ভব হয়। প্রতিভাশালী গ্রামবাসী শিশুদের টার্গেট গ্রুপ হিসাবে চিহ্নিত করা তথা তাদের আবাসিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শামিল করে সেরা গুণমানের শিক্ষাদানের লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই প্রকল্পের গুরুত্ব।

● **অনগ্রসর এলাকায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার :** অনগ্রসর অঞ্চল-সহ গোটা দেশজুড়েই বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানো যে নিতান্ত প্রয়োজন সেকথা সরকার স্বীকার করেছে। বর্তমানে ১৮৮-টি কমিউনিটি কলেজ, ২৮৯-টি প্রতিষ্ঠান এবং ৬৮-টি দীনদয়াল উপাধ্যায় কৌশল কেন্দ্র চালু রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অধীনে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ পড়ানো হয়ে থাকে উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। রাজ্য সরকারগুলিও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিনির্দেশিকা মেনে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ চালু করতে পারে তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। সরকার ইতোমধ্যেই, অনগ্রসর অঞ্চল-সহ গোটা দেশগুড়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

(১) খুচরো ব্যবসা, লজিস্টিকস্, সংবাদ মাধ্যম এবং বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপ/শিক্ষানবিশিভিত্তিক ডিগ্রি স্তরের পাঠক্রম তৈরি।

(২) দেশে নিত্যদিন আরও বেশি বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান B.Voc. কোর্স-এর ডালি সাজিয়ে হাজির হচ্ছে।

(৩) চালু দক্ষতা বৃদ্ধির কোর্সগুলির পাঠক্রমকে জাতীয় নৈপুণ্য যোগ্যতা কাঠামো বা National Skill Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা।

খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১৯ ফিলহাল বিচারবিবেচনার পর্যায়ের রয়েছে। নতুন শিক্ষা নীতি চূড়ান্ত তথা অনুমোদিত হওয়ার উপরই নির্ভর করছে স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য পাঠ্যক্রম, পাঠ্যতালিকা এবং পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদির পর্যালোচনার বিষয়টি।❑

সূত্র : পি.আই.বি., মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক

যোজনা ? ক্যুইজ

১। কোন ভারতীয় ক্রিকেটারকে সম্প্রতি BCCI ‘C. K. Nayudu Lifetime Achievement Award’-এ ভূষিত করেছে?

২। ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমস কোন শহরে আয়োজিত হবে?

৩। ইসরো IDRSS সিরিজের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করবে। IDRSS-এর পুরো নাম কী?

৪। প্রস্তাবিত Farmers’ Innovation Fund কোন সংস্থার গড়ে তোলার কথা?

৫। বিশ্বকাপ-জয়ী ড্যানিয়েল ডি. রোসি সম্প্রতি অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি কোন দেশের ফুটবলার?

৬। Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) কোন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার?

৭। কোন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার Hastings International Chess Congress জিতেছেন?

৮। জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে ‘জল-জীবন-হরিয়ালি মিশন’ কোন রাজ্যে চালু হয়েছে?

৯। কাকে Missile Woman of India বলা হয়?

১০। সোলার পার্ক নির্মাণের জন্য কোন দেশকে ভারত ৭৫ মিলিয়ন ডলারের ঋণ (line of credit–LOC) দিয়েছে?

১১। দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে কোন রাজ্যে ‘আরোগ্যশ্রী’ প্রকল্প চালু আছে?

১২। ২০২০ সালে কোন ছবি ‘Best Motion Picture—Drama’ বা শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে Golden Globe পেয়েছে?

১৩। প্রতি বছর World Braille Day কবে পালন করা হয়?

১৪। কোন রাজ্যের পরিবহণ বিভাগ সম্প্রতি মহিলাদের জন্য ‘দামিনী’ নামক একটি হেল্পলাইন চালু করেছে?

১৫। ভারতে National Disaster Response Force (NDRF) Academy কোন শহরে গড়ে উঠবে?

১৬। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি কোন সংস্থার পাঁচটি ‘Young Scientists Labs’-এর উদ্বোধন করেন?

১৭। ২০২০ সালকে কোন রাজ্য ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বছর’ (Year of Artificial Intelligence) হিসেবে ঘোষণা করে?

১৮। উমারো সিসোকো ইম্বালো সম্প্রতি কোন দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন?

১৯। ২০১৯-’২০ অর্থবর্ষের প্রথমার্দ্ধে কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বা foreign direct investment (FDI) এসেছে ভারতে?

২০। মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে SSLV কী?

২১। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যগুলিকে ভালো কৃষি উৎপাদনের জন্য কোন পুরস্কার দেন?

২২। সম্প্রতি প্রকাশিত ‘স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ লিগ, ২০২০’-তে প্রথম স্থানে রয়েছে ইন্দোর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে কোন শহরগুলি জায়গা করে নিয়েছে?

২৩। প্রাণীজগতে *Landouria tonywhitteni* কী?

২৪। এ দেশের কোন রাজ্য ২০২০ সালের প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখকে “No Vehicle Day” হিসেবে পালন করছে?

২৫। দ্বিতীয় তেজস এক্সপ্রেস সম্প্রতি চালু হয়েছে। ট্রেনটি মুম্বাইয়ের সঙ্গে কোন শহরকে জুড়ছে?

উত্তর :

১. কে. শ্রীকান্ত। ২. বার্মিংহাম। ৩. Indian Data Relay Satellite System। ৪. ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (ICAR)। ৫. ইটালি। ৬. মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার (National Aeronautics and Space Administration)। ৭. পি. মাগেশ চন্দ্রন। ৮. বিহার। ৯. ড. টেসি টমাস; DRDO-তে Aeronautical Systems-এর মহানির্দেশক। ১০. কিউবা। ১১. অন্ধ্রপ্রদেশ। ১২. ‘1917’ (ছবির নাম)। ১৩. জানুয়ারির ৪ তারিখ। ১৪. উত্তরপ্রদেশ। ১৫. নাগপুর ১৬. Defence Research and Development Organisation (DRDO)। ১৭. তেলেঙ্গানা। ১৮. আফ্রিকার গিনি-বিসাউ (Guinea-Bissau)। ১৯. সিঙ্গাপুর। ২০. Small Satellite Launch Vehicle। ২১. ‘কৃষি কর্মন’। ২২. যথাক্রমে ভোপাল ও সুরত। ২৩. এক ধরনের শামুক; নামকরণ হয় ব্রিটিশ সংরক্ষণবাদী পরিবেশবিদ টনি হুইটেন-এর নামে। ২৪. রাজস্থান। ২৫. আহমেদাবাদ।❑

পদ্ম সম্মান

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। তার আগের দিন এবছরের পদ্ম সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবছর মোট ১৪১ জনকে পদ্ম সম্মান দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন ৭ জন। ১৬ জন পাচ্ছেন পদ্মভূষণ সম্মান। পদ্মশ্রী দেওয়া হচ্ছে ১১৮ জনকে। ক্রীড়া জগৎ থেকে পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন বক্সার মেরি কম। মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন দেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং অরুণ জেটলি। প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করা হচ্ছে। মরণোত্তর পদ্মভূষণ পাচ্ছেন দেশের আরেক প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পর্রীকরও। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রবীণ পিডিপি নেতা মুজফফর হুসেন বেগকেও পদ্মভূষণ সম্মানের জন্য বেছে নিল সরকার। পদ্মভূষণ পাচ্ছেন নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেসি এস. সি. জামির। বাংলার পদ্মশ্রী তালিকায় থাকা বীরভূমের চিকিৎসক সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ও কংগ্রেসের।

৭১-তম প্রজাতন্ত্র দিবসে সম্মানিত হলেন দেশের আট ক্রীড়াবিদ। এদের মধ্যে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ''পদ্মবিভূষণ' পাচ্ছেন বক্সার এম. সি. মেরি কম। 'পদ্মভূষণ' পাচ্ছেন ব্যাডমিন্টনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পি. ভি. সিন্ধু। মহিলাদের বক্সিংয়ে ছয় বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্স থেকে বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত মেরি রাজ্যসভার সাংসদও। তিনি ছাড়াও এবছরে আরও ছয় বিখ্যাত ব্যক্তিকে 'পদ্মবিভূষণ' দেওয়া হচ্ছে। এর আগে ২০১৩ সালে 'পদ্মভূষণ' ও ২০৬ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মান পেয়েছিলেন মেরি কম। তার আগে তিন ক্রীড়াবিদ 'পদ্মবিভূষণ' পেয়েছেন। এরা হলেন বিশ্বনাথন আনন্দ, এডমন্ড হিলারি ও শচীন তেন্ডুলকর। 'পদ্মভূষণ' পেয়েছেন মোট ১৬ জন। যার মধ্যে রয়েছেন পি. ভি. সিন্ধুও। ২০১৬ সালের রিয়ো অলিম্পিক্সে রুপো পান। এর আগে ২০১৫ সালে 'পদ্মশ্রী' হয়েছিলেন হায়দরাবাদে বেড়ে ওঠা এই ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। এছাড়াও ১৮ জন 'পদ্মশ্রী' প্রাপকের তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার জাহির খান, ভারতীয় মহিলা হকি দলের বর্তমান অধিনায়ক রানি রামপাল, প্রাক্তন ভারতীয় হকি অধিনায়ক এম. পি. গণেশ, তিরন্দাজ জিতু রাই ও তরুণদীপ রাই, ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অইনাম বেমবেম দেবী।

গত ২৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে, শিল্পপতিদের মধ্যে আনন্দ মহিন্দ্রা ও বেণু শ্রীনিবাসন, আইনবিদ মাধব মেনন (মরণোত্তর), বালকৃষ্ণ দোশি পদ্মভূষণ পাচ্ছেন। মরণোত্তর পদ্মশ্রী পাচ্ছেন সমাজকর্মী আবদুল জব্বার। তারকারাও পদ্ম তালিকা থেকে বাদ পড়েননি। অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাবত, প্রযোজক একতা কাপুর, সঙ্গীতশিল্পী আদনান সামি, গায়ক সুরেশ ওয়াড়কর অভিনেত্রী সরিতা জোশী ও নির্দেশক-প্রযোজক করণ জোহর বিনোদন জগতের সম্মানিতদের মধ্যে অন্যতম।

তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিচিত অথচ জনসেবায় নিয়োজিত মুখ পদ্ম-সম্মানে তুলে আনার কাজটা গত কয়েক বছর ধরেই করে আসছে সরকার। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। অবশ্য, সঙ্গে আছে বেশ কিছু পরিচিত নামও—

- পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী (সঙ্গীতশিল্পী)-পদ্মভূষণ।
- সৈয়দ মুয়াজ্জেম আলি (মরণোত্তর, কূটনীতিক, বাংলাদেশ) -পদ্মভূষণ।
- মণিলাল নাগ (যন্ত্রশিল্পী)-পদ্মশ্রী।
- কাজী মাসুম আখতার (মাদ্রাসা শিক্ষক)-পদ্মশ্রী।
- অরুণোদয় মণ্ডল (চিকিৎসক)-পদ্মশ্রী।
- সুজয়কুমার গুহ (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিহার)-পদ্মশ্রী।
- পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সমাজবিজ্ঞানী, ফ্রান্স)-পদ্মশ্রী।
- পদ্মাবতী বন্দ্যোপাধ্যায় (চিকিৎসক, উত্তরপ্রদেশ)-পদ্মশ্রী।
- শান্তি রায় (চিকিৎসক, বিহার)-পদ্মশ্রী।
- এনামুল হক (প্রত্নতত্ত্ববিদ, বাংলাদেশ)-পদ্মশ্রী।❑

সূত্র : padmaawards.gov.in

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা

যোজনা ডায়েরি

(জানুয়ারি ২০২০)

আন্তর্জাতিক

● **রাশিয়ার সংবিধান সংশোধন পুতিনের :**

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সংবিধান সংশোধনে সমর্থন জানিয়ে গত ১৬ জানুয়ারি পদত্যাগ করল প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি মেদভেদেভ-সহ দেশের পুরো মন্ত্রিসভা। নতুন প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিন। এদিন রুশ পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট পুতিন জানান, দেশের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তার কথায়, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট নয়, পার্লামেন্টের হাতে থাকা উচিত।

● **ব্রেক্সিট কার্যকর হল :**

গত ৩০ জানুয়ারি ইউরোপীয় পার্লামেন্টে পাস হয়ে গেল ব্রেক্সিট বিল। যার ফলে ৩১ জানুয়ারি স্থানীয় সময় রাত ১১-টায় (ব্রাসেলসে রাত ১২-টায়) ২৮-টি রাষ্ট্রের সমষ্টি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ব্রিটেনের বার হয়ে যাওয়ায় আর সত্যিই কোনও বাধা রইল না। ৬৮৩ সদস্যের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এদিন এই বিলের পক্ষে ৬২১-টি ভোট পড়েছে। বিপক্ষে মাত্র ৪১-টি। ২১ জন সদস্য ভোট দেননি। প্রসঙ্গত, ২০১৬-র ২৩ জুন গণভোট দিয়ে ব্রিটেন ঠিক করেছিল, ইইউ ছেড়ে যাবে তারা। তার পরে সাড়ে তিন বছর কেটে গিয়েছে। যে ডেভিড ক্যামেরনের জমানায় গণভোট হয়েছিল, তিনি ইস্তফা দেওয়ার পরে প্রথমে টেরেসা মে এবং পরে বরিস জনসন ১০, ডাউনিং স্ট্রিট দখল করেছেন। অসংখ্য বার ব্রেক্সিট বিল নিয়ে আলোচনায় ও বিতর্ক হয়েছে ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টে। শেষ পর্যন্ত আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত উপস্থিত হয়।

দীর্ঘ ৪৭ বছর পরে ইউরোপীয় জোট থেকে বেরিয়ে যায় ব্রিটেন। ইউরোপ জুড়ে যৌথভাবে স্বাধীনভাবে সফর, বাণিজ্য এবং কাজ করার দিন এবার ফুরোল। ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন 'ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি'-তে যোগ দিয়েছিল ব্রিটেন। যা ১৯৯২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর চেহারা নেয়। অবশ্য, আপাতত ইইউ-এর অধিকাংশ আইন চালু থাকবে। যেমন এবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়াতে কোনও ছেদ পড়ছে না। ততদিনে ইইউ-এর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে চিরস্থায়ী চুক্তি সেরে ফেলা যাবে বলে মনে করছে বরিসের প্রশাসন। এব্যাপারে আনুষ্ঠানিক বোঝাপড়া শুরু হবে আগামী মার্চ থেকেই। এর পরের দশ মাস গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময়ের মধ্যে জনসন যদি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মীমাংসা করতে না পারেন, তাহলে আর সময় পাবে না ব্রিটেন। তখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্ত মেনে ইইউ-এর সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে হবে ব্রিটেনকে।

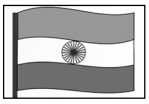

জাতীয়

● **বোলসোনারোর সঙ্গে চুক্তি সই :**

গত ২৫ জানুয়ারি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে দু'দেশের মধ্যে সই হল ১৫-টি চুক্তি। দু'দেশ এদিন যে চুক্তিগুলিতে সই করেছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো সংক্রান্ত চুক্তি। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমারের বক্তব্য, ২০২২-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৫০০ কোটি ডলার। ২০১৮-'১৯-এ যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ হাজার ২০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক লাফে এই বাণিজ্যকে প্রায় দ্বিগুণ করাটাই লক্ষ্য দু'দেশের। প্রসঙ্গত, প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে দিল্লি এসেছিলেন বোলসোনারো।

● **সেনা দিবসে ও প্রজাতন্ত্রের রাজপথে নারীশক্তি :**

সেনা দিবসের কুচকাওয়াজে এই প্রথম পুরুষ বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন মহিলা অফিসার। গত ১৫ জানুয়ারি কুচকাওয়াজে এভাবেই ইতিহাস গড়লেন ক্যাপ্টেন তানিয়া শেরগিল। ২০১৫ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে প্রথম নেতৃত্ব দেন এক মহিলা অফিসার। গত বছরে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন ভাবনা কস্তুরী। এবার মহিলা অফিসারকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেল সেনা দিবসেও। ১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতের শেষ ব্রিটিশ কমান্ডার স্যার ফ্রান্সিস বুচারের কাছ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন ফিল্ড মার্শাল কে. এম. কারিয়াপ্পা। সেই ঘটনাকে স্মরণ করতে ওই দিনটিকে সেনা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

২০১৭-র মার্চ মাসে চেন্নাইয়ের 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি' থেকে সেনার কোর অব সিগন্যালসে যোগ দেন ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশনসের স্নাতক তানিয়া। তার পরিবারের তিন প্রজন্ম বাহিনীতে ছিলেন। ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে মহিলাদের কাজ করার সুযোগ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে অনেক। তবে ধীরে ধীরে খুলছে দরজা। বছর কয়েক আগে যুদ্ধবিমান ওড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন মহিলা বায়ুসেনা অফিসারেরা। নৌসেনাতেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন মহিলারা। সেনা দিবসে তানিয়ার নেতৃত্বে কুচকাওয়াজে এই নতুন ধারাই ফের স্বীকৃতি পেল।

এরপর আবার রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজেও প্রাধান্য পেল নারীশক্তি। প্যারেডে নেতৃত্বে দেওয়া থেকে মোটরসাইকেলে কসরত দেখানো, সর্বত্রই সমানভাবে অংশ নিতে

দেখা গেল মহিলাদের। অ্যাসিকস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর সুজাতা গোস্বামীর নেতৃত্বে তার দলের পাঁচ সদস্য মোটর বাইকে 'অল রাউন্ড ডিফেন্স' প্রদর্শন করেন। এএসআই অনিতা কুমারী ভিভি-র নেতৃত্বে মোটর সাইকেলের উপর মানব পিরামিড গড়ে তোলেন ২১ জন মহিলা। চলন্ত মোটর সাইকেলের উপর দাঁড়িয়ে স্যালুট করে দেখান ইন্সপেক্টর সীমা নাগ। একইভাবে দু'হাতে পিস্তল নিয়ে চলন্ত মোটর সাইকেলের উপর দাঁড়িয়ে কসরত দেখান হেড কনস্টেবল মীনা চৌধুরী। সেনা দিবসের প্যারেডে পুরুষদের নেতৃত্ব দিয়ে সম্প্রতি ইতিহাস গড়া ২৬ বছরের ক্যাপ্টেন তানিয়া শেরগিলকে এদিনও তলোয়ার হাতে সেনাবাহিনীর পুরুষদের প্যারেডে নেতৃত্ব দেখা গেল।

● **দক্ষিণ ভারতে সুখোই-৩০ স্কোয়াড্রন :**

দক্ষিণ ভারতে প্রথম ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী সুখোই-৩০ এমকেআই স্কোয়াড্রনের সূচনা হল তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুরে। চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত এবং বায়ুসেনা প্রধান আরকেএস ভাদৌরিয়ার উপস্থিতিতে গত ২০ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে এর সূচনা হয়। এর ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দেশের জল ও আকাশসীমা আরও সুরক্ষিত হল। ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৩০০ কিলোমিটার। সুখোই-৩০ এমকেআই থেকে ভারত মহাসাগরের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারবে এই ক্ষেপণাস্ত্র। প্রাথমিকভাবে পাঁচটি দিয়ে এই স্কোয়াড্রনের সূচনা হয়েছে। ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়িয়ে ২৮-টি করা হবে বলে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে।

বায়ুসেনা প্রধান ভাদৌরিয়া বলেছেন, কৌশলগত অবস্থানের জন্য তাঞ্জাভুরে সুখোই-৩০ এমকেআই মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বায়ুসেনার দ্বিতীয় যুদ্ধবিমান স্কোয়াড্রন তৈরি হল। দক্ষিণ ভারতে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তিরুঅনন্তপুরম বায়ুসেনা ঘাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই ঘাঁটির সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথাও এদিন জানিয়েছেন বায়ুসেনা প্রধান। আরকেএস ভাদৌরিয়া বলেন, সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলছে; এই ঘাঁটির লাগোয়া এলাকায় অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আগামী চার বছরের মধ্যে পুরো সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

● **সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে জনগণনা :**

আগামী ১ এপ্রিল থেকে জনগণনা শুরু হবে। চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। জনগণনায় এবার গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর মোবাইল নম্বর দিতে হবে। এছাড়াও জানাতে হবে বাড়ির জল সরবরাহ, বাথরুম, ইন্টারনেট সংযোগ, গাড়ি-সহ ৩১-টি তথ্য। রেজিস্ট্রার জেনারেল ও জনগণনা কমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। এতদিন হাতে-কলমে জনগণনা হয়ে থাকলেও এবার তা হবে পুরোপুরি প্রযুক্তি নির্ভর। তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া হবে মোবাইল ফোনের অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিটি পরিবারের কাছে জনগণনার সময় জানতে চাওয়া হবে তাদের টেলিফোন, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন, সাইকেল, মোটরসাইকেল, চার চাকার গাড়ি, রেডিও, টেলিভিশন রয়েছে কি না। পরিবারের সদস্যেরা ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করেন কি না, তাও জানতে চাওয়া হবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, জনগণনা সংক্রান্ত বিষয় যাচাইয়ের জন্য মোবাইল নম্বর নেওয়া হবে। এছাড়া অন্য কোনও কারণ নেই।

● **অপরাধ নিয়ে কেন্দ্রীয় সমীক্ষা :**

প্রতিদিন ৯১-টি ধর্ষণ, ৮০-টি খুন আর ২৮৯-টি অপহরণ। ২০১৮ সালের নথিভুক্ত অভিযোগের খতিয়ান এ রকমই। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) ২০১৮ সালের যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে সামনে এসেছে এই পরিসংখ্যান। যদিও বাস্তবের ছবিটা এর থেকে আরও অনেকটাই ভয়াবহ। এনসিআরবি নিজেই জানিয়েছে, মৌখিক অভিযোগের মাত্র ১ শতাংশই শেষ পর্যন্ত এফআইআর পর্যন্ত গড়িয়েছে। এনসিআরবি যে পরিসংখ্যান পেশ করছে, তা কেবল এফআইআর-এর ভিত্তিতেই। এনসিআরবি-র নথি বলছে, থানায় যে লিখিত অভিযোগ (জেনারেল ডায়েরি) করা হয়, তার মধ্যে ৬০ শতাংশের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত এফআইআর করে তদন্তে নামে পুলিশ। এনসিআরবি-র দাবি, সব অভিযোগ এফআইআর হলে বাস্তবে ধর্ষণ, ডাকাতি বা খুনের ঘটনার সংখ্যা আরও বেড়ে যেত। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১.৩ শতাংশ ফৌজদারি অভিযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এনসিআরবি জানিয়েছে, ২০১৮ সালে দেশে ৩৩,৩৫৬-টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। যা আগের বছরের চেয়ে ৭৯৭-টি বেশি। সার্বিকভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা এক বছরে বেড়েছে প্রায় ২০ হাজারের কাছাকাছি। গত এক বছরে গোটা দেশে অপহরণের সংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। খুনের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দেড় শতাংশ। ২০১৮ সালে দেশে ২৯,০১৭-টি খুনের ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ খুনের পিছনে রয়েছে মনোমালিন্য ও বিবাদ। ১০ শতাংশ খুনের পিছনে দায়ী ব্যক্তিগত শত্রুতা।

● **গর্ভপাতের সময়সীমা প্রসঙ্গে :**

এখন থেকে ২০ থেকে ২৪ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করাতে দু'জন চিকিৎসকের অনুমতি লাগবে। গর্ভপাতের অধিকারের সময়সীমা বাড়াতে তিন দশকের পুরনো আইন সংশোধন করছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, গর্ভস্থ ভ্রূণের গঠনগত বা জিনগত সমস্যা থাকলে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে কোনও ঊর্ধ্বসীমা থাকবে না। মেডিক্যাল বোর্ডই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ, ২৭ বা ২৮ সপ্তাহে ভ্রূণের কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে বিষয়টি মেডিক্যাল বোর্ডে যাবে এবং তারা ছাড়পত্র দিলে গর্ভপাত করা যাবে।

পাশাপাশি ধর্ষণের শিকার, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও নাবালিকাদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের ঊর্ধ্বসীমা ২০ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৪ সপ্তাহ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতদিন ২০ সপ্তাহের পরে গর্ভপাত করাতে হলে আদালতে অনুমতি নিতে হ'ত। এখন থেকে ২০ থেকে ২৪ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করাতে দু'জন চিকিৎসকের অনুমতি লাগবে। দু'জনের একজনকে সরকারি ডাক্তার হতে হবে। ২৪ সপ্তাহও পার হয়ে গেলে বিষয়টি ফের আদালতের বিচারাধীন হয়ে যাবে।

গত ৩০ জানুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেন, মহিলাদের নিজের শরীর এবং সন্তান প্রসবের অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি অসামান্য পদক্ষেপ। ৩১ জানুয়ারি তারিখ বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, সেখানেই ১৯৭১ সালের 'মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি' আইনে সংশোধন করে 'দ্য মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২০' নিয়ে আসা হবে। মেডিক্যাল বোর্ড কাদের নিয়ে গঠিত হবে, তা কীভাবে কাজ করবে এইসব খুঁটিনাটি সংশোধিত বিলে বলা থাকবে।

● **রাষ্ট্রপতি পুরস্কার :**

কর্ণাটকের মোট ১৯ জন পুলিশকর্মীকে ৭১-তম প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হল। কর্মক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্যে এই পুরস্কার। পুরস্কৃতদের একজন কে. ভেঙ্কটেশ। তবে তার কৃতিত্ব হার মানাবে আর পাঁচজনকে। গত পাঁচ বছরে এই ট্রাফিক সার্জেন মোট ৬৮০ জন মাতাল গাড়িচালককে হাতেনাতে ধরেছেন। রেকর্ড অঙ্কের জরিমানাও সংগ্রহ করেছেন। গত ২৪ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে

মেডেল প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। দেশের মোট ১৪ জন ট্রাফিক পুলিশকর্মীর নাম এই পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়। ২০১৯ সালে ভেঙ্কটেশ জরিমানা সংগ্রহ করেছেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। কর্ণাটকের বাসাভাঙ্গুদি অঞ্চলে এককভাবে সবচেয়ে বেশি জরিমানা সংগ্রহের কৃতিত্ব তারই।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর শাখায় খড়্গপুর-সাঁতরাগাছি স্টেশনের মধ্যে ঘণ্টায় প্রায় ১৩০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চালানোর মহড়া হল গত ২৪ জানুয়ারি। ওই গতিবেগে মাত্র ৫৭ মিনিটে খড়্গপুর থেকে সাঁতরাগাছি এসে পৌঁছেছে ট্রেন ইঞ্জিন। রেলের নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থা সিআরআইএস-র ছাড়পত্র মিললেই ওই শাখায় এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিকে ১৩০ কিলোমিটার বেগে চালানো হবে।

● **আনাজ উৎপাদনে শীর্ষে বাংলা :**

আনাজ উৎপাদনে গোটা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করল পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই অর্থবর্ষে প্রায় ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টন আনাজ উৎপাদিত হয়েছে এ রাজ্যে। তা দেশের মোট আনাজ উৎপাদনের ১৫.৯ শতাংশ। উৎপাদনের নিরিখে দ্বিতীয় জায়গায় রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। ওই বছরে তাদের উৎপাদন হয়েছিল ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টন আনাজ। আগের আর্থিক বছরে উত্তরপ্রদেশ ছিল প্রথমে এবং পশ্চিমবঙ্গের ছিল দ্বিতীয় স্থানে।

● **নদী সংস্কারে বরাদ্দ ২৭০০ কোটি টাকা :**

অবশেষে বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে কাজ শুরু হতে চলেছে হুগলি জেলায়। সেচ দপ্তর জানিয়েছে, দামোদর নদের প্রায় ৩৯ কিলোমিটার বাঁধের আমূল সংস্কার করা হবে। মুণ্ডেশ্বরী নদীর ১৯ কিলোমিটার অংশ জুড়ে পলি তোলা হবে। দু'টি ক্ষেত্রেই দফায় দফায় কাজ হবে। পুরো কাজে ২৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেচ দপ্তর সূত্রের খবর, বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকল্পটির নাম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট স্কিম'। বন্যার ঝুঁকি কমাতে এবং সেচ ব্যবস্থায় উন্নতির লক্ষ্যেই এই প্রকল্প। প্রকল্পটির অনুমোদন মেলে ২০১৮ সালের শেষে। হুগলি ছাড়াও কাজ হবে বর্ধমান, হাওড়া, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া। হুগলিতে কাজটি হবে মূলত বন্যা নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই। কাজ করবে মুণ্ডেশ্বরী সেচ বিভাগ।

● **কলকাতা বন্দরের ১৫০ বছর পূর্তি :**

কলকাতা বন্দর এবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে চিহ্নিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১২ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বন্দরের ১৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে এই নামকরণের ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী এদিনের বক্তৃতায় নেহেরু মন্ত্রিসভায় দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকার কথা বলেছেন। তার বক্তব্য, দেশের প্রথম শিল্পনীতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন; চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, সিন্দ্রি সার কারখানার মতো বহু প্রতিষ্ঠান তৈরি ও লগ্নি আনার কাজ তার হাত দিয়েই শুরু হয়েছিল। মোদী আরও বলেন, এক দেশ, এক বিধান, এক নিশানের স্লোগান দিয়েছিলেন তিনি; তার সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে।

এদিন কলকাতা বন্দরের অতীতের কথা বলতে গিয়ে বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে বন্দরের ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান সরকারের 'নিউ ইন্ডিয়া'-র স্বপ্ন পূরণেও কলকাতা বন্দরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে মনে করেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশের শিল্প ক্ষেত্রের অগ্রগণ্য নীতি প্রণেতা এবং বাংলার উন্নয়নের স্বপ্ন নিয়ে আজীবন চলা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে কলকাতা বন্দরের নামকরণ করা হচ্ছে।

শ্যামাপ্রসাদের পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব কল্যাণের কর্মসূচিগুলির প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাবাসাহেব অম্বেডকরের কথা টেনে আনেন। তিনি বলেন, দেশের জলসম্পদের বিকাশের প্রথম নীতি তৈরি করেছিলেন বাবাসাহেব; ১৯৪৪ সালে কলকাতাতেই জলসম্পদ বিকাশের নীতি তৈরির এক সম্মেলন হয়েছিল। ২০১৪-র পর দেশের উন্নয়নে তার সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশের বন্দরই হচ্ছে সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার। সে কথা মাথায় রেখে সাগরমালার মতো পরিকাঠামো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পুরনো বন্দরগুলির আধুনিকীকরণ এবং নতুন বন্দর নির্মাণের কাজ চলছে পুরোদমে। মোদী বলেন, সাগরমালায় ৫৭৫-টি প্রকল্পে ৬ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি হবে; ২০০-টি প্রকল্পে ৩ লক্ষ কোটি টাকার কাজ চলছে; ১২৫-টি প্রকল্প ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মতে, জলপথে বাণিজ্য বিস্তারে কলকাতার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ, অন্যদিকে নদীপথে দেশের উত্তর-পূর্ব বা বেনারস পর্যন্ত ব্যবসা চালানোর সুযোগ কলকাতার হাতে রয়েছে। কলকাতা থেকে বেনারস ছোটো জাহাজ ইতোমধ্যেই চলতে শুরু করেছে। ২০২১-এর মধ্যে বড়ো জাহাজও যাতে চলতে পারে, সেই পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান।

এছাড়া ৩২ একর জমিতে গঙ্গাতীরের সৌন্দর্যায়ন, ক্রুজ ভেসেল চালানো, কোচি শিপইয়ার্ডের সঙ্গে নেতাজী সুভাষ ডকে জাহাজ মেরামতের কারখানা গড়া, কলকাতার ৩ নম্বর বার্থে যন্ত্রচালিত পণ্য খালাসের ব্যবস্থা করার মতো একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। বন্দরের দু'জন শতায়ু পেরনো পেনশনভোগীকে সম্মান প্রদান করেন মোদী। ১০৫ বছরে নাগিনা ভগত এবং ১০০ বছরের নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর হাতে বন্দরের তরফে স্মারক-সামগ্রী তুলে দেন তিনি। পা ছুঁয়ে প্রণামও করেন। এলআইসি-র হাতে ৫০০ কোটির পেনশন তহবিলের চেক তুলে দেওয়া ছাড়া একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে বন্দরের পেনশন তহবিলের সাড়ে তিন হাজার কোটির পুরো টাকাটাই বন্দর এলআইসি-র হাতে তুলে দিল। যা পেনশনভোগীদের আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে বলে জাহাজ মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য দাবি করেছেন।

● **নতুন দুই জেলা :**

সুন্দরবন ও বসিরহাটে দু'টি প্রশাসনিক জেলা তৈরি হবে। গত ৭ জানুয়ারি সরকারি এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, শীর্ষ স্তরে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। সুন্দরবন ও বসিরহাটের জন্য আলাদা পুলিশ জেলা আগে চালু হয়েছে। এবার তারা প্রশাসনিক জেলা হিসেবে কাজ শুরু করলে দুই ২৪ পরগণার বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন পাথরপ্রতিমায় ৮১-টি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আশ্বাসও দিয়েছেন।

জনসংখ্যা ও এলাকার নিরিখে দুই ২৪ পরগণার সুন্দরবন লাগোয়া অঞ্চল নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে ভাবনাচিন্তা চলছিল অনেক দিন ধরেই। উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার এই অংশটি জেলা সদর

বারাসত থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বসিরহাটের সুন্দরবন অংশের মানুষকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের জন্য জেলা সদরে যাতায়াত করতে হয়। একই সমস্যা দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই অংশের। সে কথা উল্লেখ করে এদিন পাথরপ্রতিমায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই অঞ্চলের মানুষের জেলা সদরে যাতায়াত করতে খুবই কষ্ট হয়; অর্থ খরচ হয়। তাই এই দু'টি নতুন প্রশাসনিক জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে কাজ চলছে।

● **স্কুলে নয়া ইংরেজি ব্যাকরণ বই :**

ইংরেজির ভিত আরও শক্ত করতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নতুন ইংরেজি ব্যাকরণ বই আনছে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দপ্তর। পঞ্চম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ বইয়ের নাম 'উইংস' এবং ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য লেখা বইটির দাম 'ফ্র্যাগরেন্স'। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের দাবি, ইংরেজি ব্যাকরণকে আরও গভীর, আরও বিস্তারিতভাবে শেখাতে এই বই দু'টি খুবই কার্যকর হবে। বই দিবসে (২ জানুয়ারি) সব সরকারি স্কুল, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। এই শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নতুন ব্যাকরণ বই ছাপা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য একই ধরনের ইংরেজি ব্যাকরণ বই প্রকাশ করা হবে।

● **সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে অনুমোদন :**

পূর্ব ভারতের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। গত ১৬ জানুয়ারি নবান্নে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানান, পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবারে ৫৬২ একর জমিতে প্রকল্পটি গড়ে উঠবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ১২৫ মেগাওয়াট। তার পরে তা সরাসরি গ্রিডে চলে যাবে। অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে ওই বিদ্যুৎ সাহায্য করবে বলে সরকারের ধারণা। প্রকল্পের জন্য জার্মানির কেএফডব্লিউ ব্যাঙ্ক থেকে ৬০০ কোটি টাকার মেয়াদি ঋণ নিচ্ছে রাজ্য। সরকার নিজে ঢালবে ১৫০ কোটি টাকা। রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম দরপত্র ডেকে নির্মাতা সংস্থা বাছাই করবে। অমিতবাবু বলেন, বিশ্বে অচিরাচরিত শক্তির উৎপাদন ঘিরে যখন আগ্রহ বাড়ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ ১২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাস্তবায়িত করে দেখাচ্ছে। দিঘায় গত ক্ষুদ্র শিল্প সম্মেলনে প্রকল্পটির প্রস্তাব এসেছিল রাজ্যের কাছে। জার্মানির ব্যাঙ্কটির প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। অর্থমন্ত্রী জানান, সেই প্রস্তাবই এদিন অনুমোদন পেল। প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত রাজ্য সরকারের হাতে থাকা ১০০০ একরের লবণাক্ত ওই জমিটি পড়েই ছিল এতদিন। এর মধ্যে ৫৬২ একরের জন্য কোস্টাল রেগুলেশন জোন ছাড়পত্র রয়েছে রাজ্যের হাতে। বাকি জমির ছাড়পত্রের জন্য রাজ্য উদ্যোগী হচ্ছে।

অর্থনীতি

- ব্যাঙ্কে আমানতের তুলনায় পিপিএফ এবং প্রবীণদের ডাকঘরের সঞ্চয়ে সুদের হার আপাতত অপরিবর্তিতই থাকছে। পয়লা জানুয়ারি অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, পিপিএফ (প্রভিডেন্ট ফান্ড), পাঁচ বছরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটে আগের মতোই ৭.৯ শতাংশ হারে সুদ মিলবে। নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছরের সঞ্চয় প্রকল্পে সুদ মিলবে ৮.৬ শতাংশ হারে। ডাকঘরে পাঁচ বছরের সঞ্চয়ে ৭.৭ শতাংশ হারেই সুদ মিলবে।
- নগদের ব্যবহার কমাতে ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি রুপে কার্ড ও ইউপিআই ব্যবস্থায় মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন সরকার। গত পয়লা জানুয়ারি থেকে যা কার্যকর হয়েছে বছরে ৫০ কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যবসা করা সংস্থায়। এবার প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের (সিবিডিটি) নির্দেশ, ওই সব সংস্থায় ডিজিটাল লেনদেনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক। নির্দেশ কার্যকর না করলে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে দৈনিক ৫০০০ টাকা করে জরিমানা গুনতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে।

● **পরিকাঠামো খাতে ১০২ কোটির লগ্নি :**

আগামী পাঁচ বছরে পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগের রোডম্যাপ প্রকাশ করল কেন্দ্র। ১০২ লক্ষ কোটির ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন (এনআইপি) ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। আগামী ২০২৪-'২৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বছরের জন্য এই পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত ৬ বছরে কেন্দ্র সরকার পরিকাঠামো খাতে খরচ করেছে ৫১ লক্ষ কোটি টাকা। আগামী পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ দ্বিগুণ।

প্রথম ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবছরের স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, পরিকাঠামো খাতে সরকার ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চায়। তার পাঁচ মাস পর সেই পরিকল্পনা ঘোষণা করে নির্মলা সীতারামণ বলেন, এটাই দেশের প্রথম এনআইপি। এই ১০২ লক্ষ কোটির পাশাপাশি আরও ৩ লক্ষ কোটি টাকা অতিরিক্ত যোগ হবে। প্রস্তাবিত এই এনআইপি-তে কেন্দ্র ও রাজ্যের ৩৯ শতাংশ করে অংশ থাকবে। বাকি ২২ শতাংশ বিনিয়োগ করবে বেসরকারি সংস্থা।

প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পরেই পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগের রূপরেখা তৈরি করতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে কেন্দ্র। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে টাস্ক ফোর্স। বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, রাজ্য সরকার, পরিকাঠামো সংক্রান্ত সংস্থা-সহ সংশ্লিষ্ট মোট ৭০-টি পক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারপর তৈরি হয়েছে রিপোর্ট। সেই টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। জানিয়েছেন, পরিকাঠামো খাতে এই বিনিয়োগের আওতায় রয়েছে ১৮-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল; তার মধ্যে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাত, রাজস্থান উল্লেখযোগ্য। এই প্রকল্পগুলি রয়েছে ২১-টি মন্ত্রকের অধীনে। আরও বলেন, এই ১০২ লক্ষ কোটি টাকা বিদ্যুৎ, রেল, সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল, নগরোন্নয়ন, জল সংরক্ষণের মতো খাতে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার।

● **আইএমএফ-এর 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক' :**

ভারতে অর্থনৈতিক ঝিমুনির প্রভাবে ধাক্কা খাবে বিশ্বের উন্নয়নও। এমনটাই মনে করে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। একথা জানিয়েছেন আইএমএফ-এর মুখ্য অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ। তার মতে, ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হওয়ায় তা বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেনে নামাবে আরও '০.১' শতাংশ নিচে। সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ৫০-তম বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয় গত ২০ জানুয়ারি। সেখানে বিশ্ব অর্থনীতির একটি সামগ্রিক ছবি তুলে ধরে আইএমএফ। স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক বিষয়ের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিস্থিতি নিয়েও পর্যবেক্ষণ রয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের।

'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক' নামে একটি রিপোর্টে আইএমএফ জানিয়েছে, বিশ্বের বহু দেশে সামাজিক অস্থিরতা তীব্রতর হচ্ছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আস্থাহীনতার প্রতিফলন

ঘটছে এবং এ বিষয়গুলি সমাধানের কোনও সংস্থান প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় নেই বলেও মনে করছে আইএমএফ। প্রসঙ্গত, আইএমএফ-এর মুখ্য অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ চিলি এবং হংকংয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। ওই দুই দেশেই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী প্রবল বিক্ষোভের নানা কারণ রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। সেই সঙ্গে বিশ্বের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সামাজিক সহাবস্থানের গুরুত্বেরও উল্লেখ করেছেন। তার মতে, সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যই সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের স্বার্থরক্ষা করাটা খুবই জরুরি। যাতে, উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা পিছনের সারিতে চলে না যায়।

● **অক্সফ্যাম-এর রিপোর্ট :**

সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের ৫০-তম বার্ষিক সম্মেলন শুরুর আগে 'টাইম টু কেয়ার' নামে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অক্সফ্যাম। এই সংগঠনের মতে, এ দেশে তো বটেই, গোটা বিশ্বেই আর্থিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। অক্সফ্যাম জানিয়েছে, বিশ্বের ৪৬০ কোটি বা ৬০ শতাংশ মানুষের কাছে যা সম্পত্তি রয়েছে, তার থেকেও বেশি সম্পদ রয়েছে ২ হাজার ১৫৩ জন ধনকুবেরের কাছে। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে আয়ের নিরিখে লিঙ্গবৈষম্যও।

রিপোর্ট বলছে, পরিচারিকার কাজ করা একজন মহিলা ২২ হাজার ২৭৭ বছরে যা আয় করবেন, তা মাত্র ১ বছরেই রোজগার করেন টেকনোলজি সংস্থার একজন সিইও। মাত্র ১০ মিনিটে ওই সিইও যা আয় করেন, সেই অর্থ নিজের ঘরে আনতে ওই পরিচারিকার লাগবে গোটা বছর। শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলাদের গার্হস্থ্য কাজের বদলে কোনও আয় হয় না। দেখা গিয়েছে, গোটা বিশ্বে মহিলারা ৩২৬ কোটি ঘণ্টার এমন কাজ করছেন প্রতিদিন, যার বদলে তাদের কোনও আয় হচ্ছে না। অর্থের নিরিখে ভারতীয় অর্থনীতিতে যার পরিমাণ প্রতি বছরে ১৯ লক্ষ কোটি টাকা। যা গত শিক্ষা বাজেটের কুড়ি গুণ বেশি (৯৩ কোটি টাকা)। প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাপী একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, গোটা আফ্রিকার মহিলাদের সম্মিলিত ধনসম্পদের থেকে বিশ্বের মাত্র ২২ জন ধনীর সম্পত্তির পরিমাণ বেশি।

● **১৬ মার্চ থেকে কার্ড ব্যবহারের নতুন ব্যবস্থা :**

গত কয়েক বছর ধরে দেশে বেড়েছে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার এবং ডিজিটাল লেনদেন। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জালিয়াতিও। তা আটকাতে গত ১৫ জানুয়ারি ব্যাঙ্ক ও কার্ড ইস্যুকারী সংস্থাগুলিতে কার্ড ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি চালু করার নির্দেশ দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যেখানে গ্রাহক চাইলে কোথায় সেই কার্ড ব্যবহার করবেন, সেই সুবিধা চালু বা বন্ধের (সুইচ-অন সুইচ-অফ) সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। থাকবে কার্ডে লেনদেনের সীমা বাঁধার সুযোগও।

শীর্ষ ব্যাঙ্ক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ১৬ মার্চ থেকে নতুন কার্ড বা নতুন করে ইস্যু করা কার্ড দেওয়ার সময়ে সেগুলিতে শুধুমাত্র ভারতে এটিএম এবং পয়েন্ট অব সেল (পিওএস)-এ ব্যবহারের সুবিধা চালু থাকবে। কোনও গ্রাহক অনলাইনে (দেশে-বিদেশে), বিদেশে উপস্থিত থেকে এবং কনট্যাক্টলেস (না ছুঁইয়ে) ব্যবস্থায় ওই কার্ড ব্যবহার করতে চাইলে আলাদা করে ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন করতে হবে। চালু থাকা কার্ডগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা কার্ড ইস্যুকারী সংস্থা ঝুঁকি বুঝে সেই সিদ্ধান্ত নেবে বলেও জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তবে যে সমস্ত চালু কার্ড কোনও দিন নেট লেনদেন, বিদেশে বা কনট্যাক্টলেস ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয়নি, সেগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে সেই সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কোনও ক্ষেত্রে (এটিএম, নেট, দেশ-বিদেশে, পিওএস অথবা কনট্যাক্টলেস) কার্ডে কত টাকা পর্যন্ত লেনদেন করা যাবে অথবা সেটি কখন চালু বা বন্ধ করা যাবে, গ্রাহক যাতে সহজে সেই সিদ্ধান্ত পারেন, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। সেক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ, নেট ব্যাঙ্কিং, এটিএম, ইন্টার-অ্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্সের (আইভিআর) সুবিধা রাখতে হবে তাদের। ব্যাঙ্কের শাখা বা অফিসেও এই সুবিধা দেওয়া হতে। কার্ডের ধরনে কোনও বদল হলে এসএমএস, ই-মেলের মাধ্যমে তা গ্রাহককে জানাতে বাধ্য থাকবে ব্যাঙ্কগুলি। তবে প্রিপেড গিফ্‌ট কার্ড বা যাতায়াতের জন্য কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ব্যাঙ্ক ও কার্ড ইস্যুকারী সংস্থাগুলিকে প্রচার চালানোর কথাও বলেছে তারা।

● **সৌরবিদ্যুতে ৫০,০০০ কোটি এনটিপিসি-র :**

তাপ বিদ্যুতের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে আরও জোর দিচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনটিপিসি। ২০২২ সালের মধ্যে আরও ১০ গিগাওয়াট বা ১০,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলতে চাইছে সংস্থাটি। সেজন্য প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে তারা। চলতি ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষের মধ্যে ২,৩০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র ডাকার কাজ শেষ করবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি। পরবর্তী দু'টি অর্থবর্ষে (২০২০-'২১ ও ২০২১-'২২) আরও ৪ গিগাওয়াট করে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই বড়ো সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির জন্য দেশে-বিদেশে 'গ্রিন বন্ড' ছেড়ে বাজার থেকে টাকা তুলতে চায় এনটিপিসি। ভাবনায় রয়েছে অন্যান্য পন্থাও। আর্থিক দিক দিয়ে যেটা সংস্থার পক্ষে সুবিধা হবে, সেটাই বেছে নেওয়া হবে।

এনটিপিসি যে প্রকল্পগুলি গড়বে, তার মধ্যে অনেকগুলির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিক্রির জন্য কোনও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি (২৫ বছর) করা হবে না। বাণিজ্যিক গ্রাহকদের পাশাপাশি এনার্জি এক্সচেঞ্জে ওই বিদ্যুৎ বিক্রি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের মধ্যে দেশে অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৭৫ গিগাওয়াট বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। যার মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ, ৬০ গিগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ, জৈব (বায়োমাস) ব্যবস্থায় ১০ গিগাওয়াট ও ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

● **নয়া স্বাস্থ্য বিমা :**

নতুন একটি পলিসি আনতে সমস্ত সাধারণ ও স্বাস্থ্য বিমা সংস্থাকে নির্দেশ দিল নিয়ন্ত্রক আইআরডিএআই। গত ২ জানুয়ারি এক নির্দেশে তারা বলেছে, এই বিমার ন্যূনতম বিনামূল্য হতে হবে ১ লক্ষ টাকা। আর সর্বাধিক ৫ লক্ষ। নাম হতে হবে আরোগ্য সঞ্জীবনী পলিসি। গ্রাহকের ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ যাতে উঠে আসে, সেজন্যই এই নির্দেশ।

আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে এই প্রকল্প চালু করতে হবে সংস্থাগুলিকে। বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার নানা ধরনের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প বাজারে চালু রয়েছে। যার মধ্যে থেকে নিজেরটি বেছে নিতে অনেক সময়েই বিভ্রান্তির মুখে পড়েন গ্রাহকেরা। নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে, অন্তত ন্যূনতম পরিষেবার ক্ষেত্রে সমতা আনতেই এই উদ্যোগ।

প্রকল্পে যোগ দেওয়া যাবে ১৮ বছর থেকে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত। প্রতি বছর প্রিমিয়াম দিয়ে পলিসি নবীকরণ করাতে হবে। পরিবারের সকলের জন্যও (ফ্যামিলি ফ্লোটার) এটি কেনা যাবে। তবে এতে কোনও অতিরিক্ত সুবিধা (ক্রিটিক্যাল ইলনেস কভার ইত্যাদির মতো রাইডার) মিলবে না। কোনও টাকা দাবি না করলে বিনামূল্য বৃদ্ধি পাওয়া-সহ অন্যান্য সুবিধাও থাকবে। হাসপাতালে ভর্তির আগে ও পরে নির্দিষ্ট কিছু দিন চিকিৎসার টাকাও মিলবে এই বিমার আওতায়।

● **সমবায় ব্যাঙ্ক নিয়ে নয়া নির্দেশ :**

যেসব শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কে (আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক) আমানত ১০০ কোটি টাকার বেশি, সেখানে এক বছরের মধ্যে বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট (বিওএম) তৈরির নির্দেশ দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ওই সব ব্যাঙ্কে সাধারণ মানুষের টাকা জমা থাকে। তা সুরক্ষিত রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। বর্তমানে ওই ধরনের সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্বে থাকে পরিচালন পর্ষদ (বোর্ড অব ডিরেক্টর্স)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ, পর্ষদের পাশাপাশি কাজ করবে এই বিওএম। পর্ষদেরই দায়িত্ব হবে ব্যাঙ্কিং ও সমবায় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সেটি তৈরি করা। প্রতিটি বিওএম-এর সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১২। এছাড়াও থাকবেন একজন চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার। তার ভোট দানের অধিকার থাকবে না। শীর্ষ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের কাজ হবে ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজ দেখভাল করা এবং সমবায় ব্যাঙ্কের নীতি নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালন পর্ষদকে সাহায্য করা। বর্তমান ব্যবস্থায় পর্ষদ একাই পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ দেখাশোনার পাশাপাশি তার সমবায় সমিতি সংক্রান্ত কাজও দেখে।

● **এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রির সিদ্ধান্ত :**

এয়ার ইন্ডিয়ার ১০০ শতাংশ মালিকানাই বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এই মর্মে গত ২৭ জানুয়ারি একটি আগ্রহপত্রও প্রকাশ করেছে তারা। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে ১৭ মার্চ। কেন্দ্রের প্রকাশিত আগ্রহপত্রে বলা হয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ১০০ শতাংশ এবং এয়ার ইন্ডিয়া স্যাটস-এর ৫০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হবে। পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে, যারা এই বিমান সংস্থা কিনবে, তাদের এয়ার ইন্ডিয়ার ২৩ হাজার ২৮৩ কোটি টাকার দেনার দায়ও নিতে হবে। তবে এই মালিকানা দেশীয় কোনও সংস্থার হাতেই ছাড়তে চাইছে কেন্দ্র।

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে লাভের মুখ দেখেনি এয়ার ইন্ডিয়া। ঋণের ভারে জর্জরিত এবং ধুঁকতে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত এই বিমান সংস্থাটিকে বাঁচাতে সরকারকে অর্থ সাহায্য করতে হয়েছে। শেষমেশ সংস্থাটির অধিকাংশ শেয়ার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। ২০১৮-তে এয়ার ইন্ডিয়ার ৭৬ শতাংশ মালিকানা বিক্রি করার জন্য আগ্রহপত্র ছেড়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু তাতেও খুব একটা সন্তোষজনক সাড়া না মেলায় এবার এয়ার ইন্ডিয়ার পুরো শেয়ারই বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সরকার।

● **পেনশন প্রাপকদের জন্য ব্যবস্থা :**

পেনশন চালু রাখার জন্য প্রতি বছর পেনশন প্রাপকের লাইফ সার্টিফিকেট যাতে যথা সময়ে জমা পড়ে, তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। সম্প্রতি কেন্দ্রের পেনশন বিষয়ক বিভাগ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, পেনশন প্রাপকদের নির্দিষ্ট সময়ে এসএমএস অথবা ই-মেলের মাধ্যমে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার কথা মনে করাতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর এবং ১, ১৫ ও ২৫ নভেম্বর তা পাঠাতে হবে। সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে।

যারা এসএমএস বা ই-মেল পাঠানো সত্ত্বেও লাইফ সার্টিফিকেট দেবেন না, তাদের কাছে ব্যাঙ্কগুলিকে একই পদ্ধতিতে জানতে চাইতে হবে যে ঘরে বসে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে ব্যাঙ্কের কর্মীকে ডাকতে চান কি না। যদি চান, তা হলে পেনশন প্রাপকের বাড়ি গিয়ে লাইফ সার্টিফিকেট নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে ব্যাঙ্ককে। এজন্য ফি দিতে হবে গ্রাহককে। তবে তা কোনও ক্ষেত্রেই ৬০ টাকার বেশি হবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কতজন গ্রাহক লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেননি, তার সংখ্যা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পেনশন প্রক্রিয়াকরণ সেলকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে পেনশন বিভাগে। যারা সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাদের কতজন সশরীরে ব্যাঙ্কে এসে ও কতজন ডিজিটাল ব্যবস্থায়, তাও জানাতে হবে। রিপোর্ট জমা দিতে হবে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চে।

● **আইবিএম-এর সিইও অরবিন্দ কৃষ্ণ :**

আমেরিকার টেক জায়ান্টের মাথায় চড়ে বসলেন ফের এক ভারতীয়। মাইক্রোসফট, গুগল এবং মাস্টারকার্ডের পর এবার আইবিএম-এর সিইও হলেন এক ভারতীয়। টেক জায়ান্ট আইবিএম-এর সিইও নিযুক্ত করা হল অরবিন্দ কৃষ্ণকে। বর্তমানে তার বয়স ৫৭ বছর। এতদিন আইবিএম-এর সিইও ছিলেন ভার্জিনিয়া রোমেটি। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি আইবিএম-এর সঙ্গে যুক্ত। তার পরবর্তীতে এই দায়িত্বভার দেওয়া হবে অরবিন্দ কৃষ্ণকে। এবছর ৬ এপ্রিল থেকে তিনি সিইও পদে যোগ দেবেন। অরবিন্দ কৃষ্ণ কানপুর আইআইটি-র প্রাক্তনী। ১৯৮৫ সালে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হন। তারপর ১৯৯১ সালে ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় থেকে পিএইচডি করেন। আইবিএম-এ যোগ দিয়েছিলেন পিএইচডি সম্পূর্ণ করার আগেই। ১৯৯০ সালে। বর্তমানে তিনি আইবিএম-এর ক্লাউড অ্যান্ড কগনিটিভ সফটওয়্যার ইউনিটের প্রধান পদে রয়েছেন।

২০১৯ সালে রেড হ্যাট সংস্থা কিনে নেয় আইবিএম। এর পিছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল এই অরবিন্দ কৃষ্ণর। এছাড়াও ইনস্টিটিউট অব ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারস এবং এসিএম জার্নালের সম্পাদক তিনি। বর্তমানে আমেরিকার টেক গ্রুপগুলোর অনেকেরই মাথায় রয়েছেন ভারতীয়রা। যেমন, মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেল্লা, গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই, মাস্টারকার্ডের সিইও অজয় বাঙ্গা। এবার সেই ভারতীয় সিইও-র তালিকায় যোগ হলেন অরবিন্দ কৃষ্ণও।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **মহাকাশের পথে জিস্যাট-৩০ :**

দেশের টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে নতুন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। তারা জানিয়েছে, ভারতীয় সময় গত ১৬ জানুয়ারি রাত ২-টো ৩৫ মিনিটে ফ্রেঞ্চ গায়ানা থেকে এরিয়ান-৫ রকেটে চাপিয়ে 'জি-স্যাট-৩০' নামে ওই উপগ্রহটিকে মহাকাশে পাঠানো হয়। ওই রকেটে একটি ইউরোপীয় কৃত্রিম উপগ্রহও মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। ইসরো সূত্রের খবর, ইনস্যাট-৪ উপগ্রহ এতদিন যে কাজ করত তার জায়গা নেবে 'জি-স্যট ৩০'। ইসরোর চেয়ারম্যান কে. শিবন জানিয়েছেন, প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোগ্রাম ওজনের এই নতুন কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশ থেকে ডিজিট্যাল প্রযুক্তি-নির্ভর তথ্য লেনদেনের কাজে লাগবে। 'জি-স্যাট-৩০'-র মাধ্যমে মূলত ডিটিএইচ, এটিএম, শেয়ার বাজার, টেলিভিশন সংক্রান্ত পরিষেবা উন্নত হবে। ভারত ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া ও আরব দুনিয়ার একাংশেও এই উপগ্রহ পরিষেবা দেবে বলে শিবন জানান।

ইসরো জানিয়েছে, উৎক্ষেপণের ৩৫ মিনিট ২৫ সেকেন্ড পরে রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায় ভারতীয় উপগ্রহটি। বেঙ্গালুরুর কাছে হাসানে থাকা ইসরোর 'মাস্টার কন্ট্রোল ফেসিলিটি' শাখার ইঞ্জিনিয়ারেরা তারপর থেকে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা। 'জি-স্যাট-৩০' আপাতত

একটি উপবৃত্তাকার 'জিয়োসিনক্রোনাস' কক্ষপথে রয়েছে। উপগ্রহটি তার যথাযথ পরিস্থিতিতে রয়েছে। আগামী দিনে আরও দু'বার উপগ্রহটির উচ্চতা বদল করা হবে। শেষমেশ সেটিকে নিরক্ষরেখার থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার উপরের একটি কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। তারপরেই সেকাজ শুরু করবে বলে ইসরো সূত্রের খবর। ইসরো সূত্র জানিয়েছে, 'ইনস্যাট' গোত্রের উপগ্রহগুলি দিয়ে টেলি-যোগাযোগ সংক্রান্ত পরিষেবার কাজ শুরু হয়েছিল। এবার সেগুলির মেয়াদ ফুরোতে থাকায় 'জি-স্যাট' উপগ্রহগুলিকে সেই কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে।

● **দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা প্রসঙ্গে :**

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব মেডিসিন'-এর সাম্প্রতিক গবেষণা জানিয়েছে, ১৬০ বছর বা তার কিছুটা বেশি সময় আগে আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা যা ছিল, সেই ঊনিশ শতকের উষ্ণতা আমরা ধরে রাখতে পারিনি। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কমে গিয়েছে ১ ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি। উন্নততর একুশ শতকে পৌঁছে।

ফলে, জ্বর মাপার সময় থার্মোমিটারে যে তাপমাত্রাকে (৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিই, তাও এখন অস্বাভাবিকই! গত ২০০ বছরে সেই স্বাভাবিকতা নেমে পৌঁছেছে ৯৭.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। কমেছে মহিলাদের দেহের তাপমাত্রাও। তবে সেই হার পুরুষের তুলনায় সামান্য কম। মহিলাদের শরীরের গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা এখন ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'ইলাইফ'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়।

● **ব্যোম মিত্রা :**

গত ২২ জানুয়ারি সংবাদ মাধ্যমের মাইক্রোফোনের সামনে ঝরঝরে ইংরেজিতে সে জানাল, অস্ত্রোপচার করতে পারে, আবার সুইচ প্যানেলও সারাতে পারে। টুকটাক কাজের ফাঁকে কোন সঙ্গীর কী নাম, তাও একবার দেখেই বলতে পারবে। আবার সঙ্গীরা কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেও পারদর্শী সে। নিজের নামও বলেছে ওই তরুণী—'ব্যোম মিত্রা'। যন্ত্রমানবী। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি। ২০২২-এর ভারতের মহাকাশ অভিযানে চার মানব-নভশ্চরের সঙ্গে তাকেও পাঠাবে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। 'ব্যোম মিত্রা' মহাকাশযানে ছোটোখাটো পরীক্ষা করবে এবং পৃথিবীতে ইসরোর কমান্ড সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ করবে। এই যন্ত্রমানবী অবশ্য অনড়। তার পা তৈরি করা হয়নি। চেয়ারে বসে সামনে বা পাশে ঝুঁকে যাবতীয় কাজ করবে সে। কৃত্রিম মেধায় সে যাবতীয় কাজ করবে, সঙ্গীদের চিনতে পারবে, সাহায্য করবে কথোপকথনে।

খেলা

- আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় নজির সৃষ্টি করল ক্যানিংয়ের দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী চম্পা নাইয়া। গত ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি নেপালের কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম এশিয়া কাপ ওপেন ইন্টারন্যাশনাল ফুল কন্ট্যাক্ট ক্যারাটে টুর্নামেন্ট ২০২০। ১০-টি দেশ ওই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। তার মধ্যে চম্পা ৫০-৫৫ কেজি বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।
- গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া ২০২০ যুব গেমসের আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে সোনা জিতলেন বাংলার মেয়ে ঋতু দাস। হুগলির বাঁশবেড়িয়ার মেয়ে এদিন ৪৪.১ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম হন এই ইভেন্টে।

● **লোকেশ রাহুলের বিশ্বরেকর্ড :**

টানা দুই টি-২০-তে পঞ্চাশ করলেন লোকেশ রাহুল। নিউজিল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ভারতের জেতার নেপথ্যে বড়ো অবদান থাকল তার। একইসঙ্গে বিশ্বরেকর্ডও গড়ে ফেললেন তিনি। কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে তাকে উইকেটকিপার হিসেবে খেলানো হচ্ছে। অকল্যান্ডে গত ২৪ জানুয়ারি প্রথম কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে উইকেটকিপার হিসেবে খেলেছিলেন। আর ২৬ জানুয়ারি উইকেটকিপার হিসেবে এই ফরম্যাটে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচ। আর উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে কেরিয়ারের প্রথম দুই টি-২০ আন্তর্জাতিকেই হাফ-সেঞ্চুরি করলেন লোকেশ রাহুল। যা বিশ্বরেকর্ড। এর আগে কোনও উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দেশের হয়ে প্রথম দুই টি-২০-তে পঞ্চাশ করেননি।

● **ফেডেরারের ১০০-তম জয় অস্ট্রেলীয় ওপেনে :**

গত ২৫ জানুয়ারি। মেলবোর্ন পার্কে রজার ফেডেরার ম্যাচটা জিতে উঠলেন। সুইস মহাতারকার অস্ট্রেলীয় ওপেন প্রতিযোগিতায় ঐতিহাসিক ১০০-তম জয় এল। তাও পাঁচ সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরে টাইব্রেকারে। ফল ৪-৬, ৭-৬ (৭-২), ৬-৪, ৪-৬, ৭-৬ (১০-৮)। ফেডেরারের লড়াই ছিল অস্ট্রেলিয়ার অবাছাই জন মিলম্যানের বিরুদ্ধে। প্রথম সেটেই মিলম্যান এগিয়ে যান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট দখল করে ফেডেরার ঘুরে দাঁড়ান। কিন্তু চতুর্থ সেট দখল করে সমতা ফেরান মিল্যান। খেলা গড়ায় পঞ্চম সেটে এবং টাইব্রেকারেও। ১০ পয়েন্টের ম্যাচ টাইব্রেকে এক সময় ৪-৮-এ পিছিয়ে গিয়েছিলেন ফেডেরার। কিন্তু সেখান থেকে নিজের অভিজ্ঞতা উজাড় করে সেট ও ম্যাচ দখল করে নেন। আগেই উইম্বলডনে ১০০-তম ম্যাচ জয়ের নজির গড়ে ফেলেছেন ফেডেরার। এবার টেনিসের ইতিহাসে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে দু'টি ভিন্ন গ্র্যান্ড স্ল্যামে ম্যাচ জয়ের সেঞ্চুরি করলেন। তার ধারে কাছে কেউ নেই আপাতত। দ্বিতীয় স্থানে জিমি কোনর্স। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ৯৮-টি জয় নিয়ে। তার পরে রাফায়েল নাদাল। ফরাসি ওপেনে নাদাল জিতেছেন ৯৩-টি ম্যাচ। মুখোমুখি লড়াইয়ে ৩-১ মিলম্যানের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার পথে ফেডেরার ৬২-টি উইনার, যার মধ্যে ১৬-টি এস সার্ভিস মারেন। তবে একই সঙ্গে ৮২-টি আনফোর্সড এররও (অনিচ্ছাকৃত ভুল) করেন।

● **চ্যাম্পিয়ন সানিয়া মির্জার প্রত্যাবর্তন :**

দু'বছর পর কোর্টে নেমেই নাদিয়া কিচেনককে সঙ্গী করে হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রফি জিতে নিলেন সানিয়া মির্জা। ১ ঘণ্টা ২১ মিনিটের লড়াইয়ে সানিয়া ও ইউক্রেনের নাদিয়া ৬-৪, ৬-৪-এ হারালেন চিনা জুটি শাউই পেং ও শুয়াই ঝাংকে। ফাইনালে শুরুটা দারুণ করে অবাছাই সানিয়া ও নাদিয়া জুটি। প্রথম গেমে তারা ব্রেক করেন চিনা জুটিকে। পরের গেমেই অবশ্য নিজেদের সার্ভিস নষ্ট করেন। এর পরে একটা গেম সানিয়ারা জেতেন তো পরের গেমেই ফিরে আসেন চিনা জুটি। প্রথম সেটের ফলাফল যখন ৪-৪, তখনই সানিয়ারা ফের ব্রেক করেন প্রতিপক্ষকে। প্রথম সেট আর জিততে সমস্যা হয়নি তাদের। দ্বিতীয় গেমেও প্রতিপক্ষকে ব্রেক করে এগিয়ে যান সানিয়ারা। দ্বিতীয় গেমেও এক সময়ে খেলার ফল ছিল ৪-৪। এই সময়ে সানিয়া ও নাদিয়া চাপ বাড়ান পেং ও ঝাং-এর উপরে। ম্যাচ জিততেও আর সমস্যা হয়নি তাদের। এটা হায়দরাবাদি কন্যার ৪২-তম ডব্লিউটিএ ডাবলস ট্রফি। ২০০৭ সালে বেথানি মাটেক-স্যান্ডস-এর সঙ্গে জুটি বেঁধে সানিয়া জিতেছিলেন ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রফি। তার পরে এবার হোবার্টে

ডব্লিউটিএ খেতাব জিতলেন তিনি। মা হওয়ার জন্য ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ডব্লিউটিএ সার্কিটে নামেননি সানিয়া।

● **এটিকে-মোহনবাগান সংযুক্তিকরণ :**

জল্পনার অবসান। দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল সংযুক্তিকরণের ব্যাপারে। অবশেষে গত ১৬ জানুয়ারি এটিকে-র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল মোহনবাগান। ২০২০ সালের জুন মাস থেকে যা চালু হবে। এদিন এই দুই ক্লাবের একসঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঘোষণা করা হল। যাতে জানা গেল যে মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবের ৮০ শতাংশ শেয়ার নিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আরপিএসজি গ্রুপ। বাকি ২০ শতাংশ শেয়ার থাকল মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেডের হাতে থাকল। আইএসএল-এ পরের মরসুমে মোহনবাগানের খেলতে আর কোনও বাধা রইল না। 'এটিকে মোহনবাগান' নাম হচ্ছে সংযুক্তিকরণের পর। এই নামেই আগামী দিনে নানা প্রতিযোগিতায় খেলবে ক্লাব।

● **আইসিসি-র সম্মান :**

ভারতীয় ক্রিকেটের পতাকাবাহক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহালি। আইসিসি-র কাছ থেকে পেলেন স্বীকৃতি। গত বছর ওয়ান ডে ক্রিকেটে রান মেশিন ছিলেন তিনি। বিশ্বকাপে করেছিলেন পাঁচটি সেঞ্চুরি। এক বছরে হাঁকিয়েছিলেন সাত-সাতটি শতরান। সেই রোহিত শর্মাকে আইসিসি ২০১৯ সালের বর্ষসেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটার নির্বাচিত করেছে। ২৮-টি ম্যাচ থেকে 'হিটম্যান'-এর সংগ্রহ ১৪০৯ রান। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালিকে আইসিসি-র টেস্ট ও ওয়ান ডে দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করা হয়েছে।

তার পাশাপাশি কোহালিকে দেওয়া হয়েছে 'স্পিরিট অব ক্রিকেট' পুরস্কার। বল বিকৃতি কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল স্মিথকে। নির্বাসন কাটিয়ে বিশ্বকাপে ফিরেছিলেন তিনি। ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ চলাকালীন স্মিথকে 'দুয়ো' দেন দর্শকরা। দর্শকদের এমন আচরণ দেখে স্থির থাকতে পারেননি ভারত অধিনায়ক। দর্শকদের শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। ক্রিকেট মাঠে কোহালির এই স্পিরিট দেখে আইসিসি বিশেষ সম্মান দিয়েছে বিরাটকে।

রোহিত-কোহালির পাশাপাশি আর এক ভারতীয়র দুরন্ত পারফরম্যান্সকে স্বীকৃতি দিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-২০ ম্যাচে দীপক চহার মাত্র সাত রানে ছ'টি উইকেট তুলে নেন। তার ওই আগুনে বোলিংয়ে ম্যাচ জিতেছিল ভারত। চহারের ওই স্পেলকে আইসিসি টি-২০ ক্রিকেটে বছরের সেরা পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দিয়েছে।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম কনকাশন সাব মার্নাস লাবুশানে। অ্যাশেজে জোফ্রা আর্চারের বাউন্সার আছড়ে পড়েছিল স্টিভ স্মিথের হেলমেটে। স্মিথের জায়গায় কনকাশন সাব হিসেবে নেমেছিলেন লাবুশানে। এ হেন লাবুশানে এখন আইসিসি-র টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন। আইসিসি লাবুশানেকে বর্ষসেরা এমার্জিং ক্রিকেটার হিসেবে বেছে নিয়েছে। গত বছর ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন বেন স্টোকস। তাকে স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি দিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার হয়েছেন প্যাট কামিন্স।

❖ **আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট দল :** অস্ট্রেলিয়া ও ভারত—টেস্টে গত বছর অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে দুই দল। তাদের পারফরম্যান্সকেই স্বীকৃতি দিয়ে বর্ষসেরা টেস্ট দলে ঘোষণা করল আইসিসি। দলে রাখা হয়েছে পাঁচ অজি ও দুই ভারতীয় তারকাকে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে এই দলে নেই কোনও ভারতীয় বোলার। দেখে নেওয়া যাক কেমন হল আইসিসি-র সেই দল :

❍ **ময়াঙ্ক আগরওয়াল :** ২০১৮-এর একেবারে শেষ দিকে, ২৬ ডিসেম্বর টেস্ট অভিষেক হয়েছিল এই ভারতীয় ওপেনারের। তারপর থেকে ৯-টি টেস্টে ৬৭-এর উপর ব্যাটিং গড়ে ভারতের ওপেনিংয়ে ভরসা দিয়ে চলেছেন ময়াঙ্ক। আইসিসি-র দলেও ওপেন করবেন তিনিই।

❍ **টম লাথাম :** তিনটি সেঞ্চুরি-সহ এই বছরটা খুবই ভালো কেটেছে এই কিউয়ি ওপেনারের। নিউজিল্যান্ডকে বহু ক্ষেত্রে একাই রক্ষা করেছেন তিনি। দলে দ্বিতীয় ওপেনার হিসাবে তাকেই রেখেছে আইসিসি।

❍ **মার্নাস লাবুশানে :** কনকাশান সাব থেকে একেবারে দলের সেরা ব্যাটসম্যান—মার্নাস লাবুশানের উত্থান সত্যিই চমকে দেওয়ার মতোই। স্মিথের বদলি হিসাবে নামার আগে পর্যন্ত টেস্টে তার কোনও সেঞ্চুরিই ছিল না। তারপর থেকে শুধু রানই করে গিয়েছেন তিনি। ১৪ ম্যাচে ৬৩-এর বেশি গড়ে ইতোমধ্যেই ১৪৫৯ রান করে ফেলেছেন তিনি।

❍ **বিরাট কোহালি :** ওয়ান ডে-র মতো আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট দলেও অধিনায়ক বিরাট কোহালি। টেস্টে ইতোমধ্যেই ২৭ সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান। টেস্টে গড় প্রায় ৫৫। এই দলের চার নম্বরে থাকছেন তিনি।

❍ **স্টিভ স্মিথ :** বিরাটের পরই থাকছেন এই অজি ডানহাতি। টেস্টে অনেকেই স্মিথকে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানের তকমা দেন। ৬৩ গড়ে সাত হাজারেরও বেশি রান করা স্মিথের রয়েছে ২৬-টি সেঞ্চুরি।

❍ **বেন স্টোকস :** ওয়ান ডে-র মতো টেস্ট দলেরও একমাত্র অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। ৬১ টেস্টে ৩৬-এর উপর ব্যাটিং গড়, সঙ্গে ১৪২ উইকেট, ব্রিটিশ এই অলরাউন্ডার যেকোনও দলেরই সম্পদ।

❍ **বিজে ওয়াটলিং :** ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে টেস্টে অভিষেক ঘটে ওয়াটলিংয়ের। ৬৮-টি টেস্ট ম্যাচ থেকে ৩,৬৪৪ রান করেছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের হয়ে প্রথম উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি করেন ওয়াটলিং (২০৫)।

❍ **প্যাট কামিন্স :** আইসিসি-র টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে কামিন্স শীর্ষে। আগের থেকেও তিনি পরিণত। ২০১৯ সালে ৯৯-টি আন্তর্জাতিক উইকেট পেয়েছেন এই অজি বোলার। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে বছরে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক এই অজি পেসারই।

❍ **মিচেল স্টার্ক :** ভালো ছন্দে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ হাতি এই পেসার। নিউজিল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে যথেষ্ট বেগ দিয়েছেন এই বাঁ হাতি বোলার। ৫৭-টি টেস্ট ম্যাচ থেকে স্টার্কের সংগ্রহ ২৪৪-টি উইকেট।

❍ **নিল ওয়্যাগনার :** ৪৭-টি টেস্ট ম্যাচ থেকে ২০৪-টি উইকেটের মালিক ওয়্যাগনার। অজিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ওয়্যাগনার ২০০-টি উইকেট নেন।

❍ **নাথান লায়ন :** সম্প্রতি লায়নের স্পিন সামলাতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ৯৬-টি টেস্ট ম্যাচ থেকে ৩৯০-টি উইকেট নেওয়া হয়ে গিয়েছে এই অফ স্পিনারের। নিজের সীমাবদ্ধতার কথা ভালোই জানেন তিনি। বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার রাস্তায় হাঁটেন না।

❖ **আইসিসি-র বর্ষসেরা ওয়ান ডে দল :** গত ১৫ জানুয়ারি বর্ষসেরা ওয়ান ডে দল ঘোষণা করল আইসিসি। সে দলে রয়েছেন চার ভারতীয় দলের অধিনায়ক করা হয়েছে বিরাট কোহালিকে। দেখে নেওয়া যাক আইসিসি-র সেই দলে কারা থাকলেন—

❍ **রোহিত শর্মা :** সারা বছর দুর্দান্ত ফর্মে খারাপ পুরস্কার পেলেন হিটম্যান। বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। আইসিসি-র দলের ওপেনার তিনিই। ওয়ান ডে-তে ৪৯ গড়ে আট হাজার ৯৫৪ রান রয়েছে রোহিতের।

❍ **শেই হোপ :** ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানকে দ্বিতীয় ওপেনার হিসাবে বেছে নিয়েছে আইসিসি। ইনিংস গড়ার ক্ষেত্রে তিনি

যে কতটা দক্ষ, সে প্রমাণ তিনি রেখেছেন বারবার। ৭৫-টি ওয়ান ডে-তে হোপের গড় প্রায় ৫১! আটটি সেঞ্চুরিও রয়েছে তার।

❍ **বিরাট কোহালি :** দলের স্বার্থে তিনি যতই নিজের ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করার কথা বলুন, আইসিসি কিন্তু ভারত অধিনায়ককে রেখেছে তিন নম্বরেই। ওয়ান ডে-তে ১১ হাজার ৬২৫ রান করা কোহালিকে দলের অধিনায়কও বেছে নিয়েছে আইসিসি।

❍ **বাবর আজম :** দলের একমাত্র পাকিস্তানি এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানকে সে দেশে অনেকে কোহালির সঙ্গেও তুলনা করেন। ৭৪ ম্যাচে ৫৪-এর উপর গড় রেখে খেলা বাবর নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যান।

❍ **কেন উইলিয়ামসন :** কিউয়ি অধিনায়ককে দলের পাঁচ নম্বরে রেখেছে আইসিসি। টেস্ট হোক বা ওয়ান ডে, নিউজিল্যান্ডের সেরা ক্রিকেটার তিনিই। তবে দলের হয়ে চার নম্বরে নামেন উইলিয়ামসন।

❍ **বেন স্টোকস :** ব্যাট হোক বা বল, ইংল্যান্ডের সেরা ভরসা হয়ে উঠেছেন তিনিই। বিশ্বকাপেও তার পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। ৯৫ ওয়ান ডে-তে প্রায় ৪১ ব্যাটিং গড় এবং বল হাতে প্রায় ৪২ গড় রয়েছে স্টোকসের।

❍ **জস বাটলার :** দ্বিতীয় ব্রিটিশ ক্রিকেটার হিসাবে দলে রয়েছেন ডানহাতি বাটলার। লোয়ার অর্ডারে বিধ্বংসী ব্যাটিং করার ক্ষমতা রয়েছে তার। ১৪২ ম্যাচে প্রায় চার হাজার রান করেছেন তিনি।

❍ **কুলদীপ যাদব :** এই চায়নাম্যান বোলার যেকোনও দলের সম্পদ। এখনও পর্যন্ত ৪৩-টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন তিনি। নিয়েছেন ৯৯-টি উইকেট।

❍ **মহম্মদ শামি :** যেকোনও মুহূর্তে প্রতিপক্ষের উইকেট তুলে নিতে দক্ষ শামি। ৭৪-টি ওয়ান ডে থেকে ১৩৬-টি উইকেট নেন তিনি।

❍ **ট্রেন্ট বোল্ট :** বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে বোল্টের একাট স্পেল শেষ করে দিয়েছিল ভারতের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। ৮৯-টি ওয়ান ডে থেকে ১৬৪-টি উইকেট তার ঝুলিতে।

❍ **মিচেল স্টার্ক :** যেকোনও মুহূর্তে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং অর্ডারে ধস নামাতে পারেন স্টার্ক। ৮৬-টি ওয়ান ডে থেকে ১৭৫-টি উইকেট তার ঝুলিতে।

● **সুপার কাপ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ :**

নতুন রূপে আয়োজিত স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে সৌদি আরবের কিং আবদুল্লা স্টেডিয়ামে আতলেতিকো মাদ্রিদকে পেনাল্টি শুট আউটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের খেতাব রিয়াল মাদ্রিদের। নির্ধারিত সময়ে খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পরে পেনাল্টি শুট আউটে ৪-১-এ জেতে রিয়াল। দানি কার্ভাহাল, রদ্রিগো, লুকা মদ্রিচ এবং সের্খিয়ো র‍্যামোস গোল করেন মাদ্রিদের হয়ে। আতলেতিকোর সল নিগুয়েজ পেনাল্টি শট ফস্কান। পাশাপাশি মাদ্রিদের গোলকিপার থিবো কুর্তুয়া আতলেতিকোর হয়ে দ্বিতীয় পেনাল্টি শট মারতে আসা থমাস পার্টির প্রয়াস আটকে দেন। আতলেতিকোর হয়ে একমাত্র গোল করেন কিয়েরান ট্রিপার। আতলেতিকো আবার অতিরিক্ত সময়ের শেষ পাঁচ মিনিট ১০ জনে খেলতে বাধ্য হয়। কারণ আলভারো মোরাতাকে ফাউল করার জন্য সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ফেদেরিকো ভালভার্দে।

রিয়ালের বিরুদ্ধে এই নিয়ে আরও একবার হারের মুখ দেখতে হল আতলেতিকোকে। ২০১৬ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রিয়াল পেনাল্টিতে হারিয়েছিল আতলেতিকো। ২০১৪ চ্যাম্পিয়ন লিগ ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে জিতেছিল তারা। আতলেতিকো অবস্য ২০১৮ ইউরোপিয়ান সুপার কাপে মাদ্রিদকে হারায়। এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে জিনেদিন জিদান দুরন্ত ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন। রিয়ালকে ন'টি প্রতিযোগিতার ফাইনালে তোলার পরে ন'টিতেই চ্যাম্পিয়ন করলেন ফরাসি কিংবদন্তি। যার মধ্যে তিনটি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের।

● **সঞ্জু স্যামসনের 'অযাচিত' রেকর্ড :**

২০১৫ সালে টি-২০ আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল সঞ্জু স্যামসনের। তার পাঁচ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফের নামলেন কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। ২০১৫ সালে হারারেতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অভিষেক ম্যাচ ১৯ রান করেছিলেন স্যামসন। আর গত ১০ জানুয়ারি পুণেয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে করলেন ৬। এই পাঁচ বছরে ভারত খেলেছে ৭৩-টি টি-২০। টানা এতগুলো ম্যাচ জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন তিনি। যা ভারতীয় রেকর্ড। না চাইলেও এই রেকর্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন স্যামসন। এই তালিকায় সঞ্জুর পরে দুইয়ে আছেন উমেশ যাদব। অভিষেকের পর ৬৫-টি টি-২০ তিনি জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই রেকর্ড ইংল্যান্ডের জো ডেনলির রয়েছে। অভিষেকের পর ৭৯-টি টি-২০-তে বসে থাকার পর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডেরই লিয়াম প্লাঙ্কেট রয়েছেন সার্বিকভাবে ডেনলির পরে, দুইয়ে। তার ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৭৪। আর স্যামসন থাকলেন তিনে। ৭৩-টি টি-২০ কেটে গিয়েছে ফের ভারতের জার্সি গায়ে চাপানোর ফাঁকে। শ্রীলঙ্কার মাহেলা উদাওয়াত্তের ক্ষেত্রেও সংখ্যাটা ৭৩। তাই ডেনলি, প্লাঙ্কেটের পর যুগ্মভাবে তিনে রয়েছেন স্যামসন ও উদাওয়াত্তে।

● **ইরফান পাঠানের অবসর :**

সম্প্রতি সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন সুইঙ্গের জন্য বিখ্যাত ভারতীয় অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। ২০০৩ সালে মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে অভিষেক। তারপর ২০০৭ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী দলেরও অংশ ছিলেন। ১৬ বছরের কেরিয়ারে গড়েছেন একাধিক রেকর্ডও। ২০০৬ পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল ভারত। করাচিতে অনুষ্ঠিত টেস্টে ইরফান পাঠানের রামধনুর মতো বাঁকানো সুইঙ্গের মোকাবিলা করতে না পেরে সলমন বাট, ইউনিস খান ও মহম্মদ ইউসুফ প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। টেস্টের প্রথম ওভারেই হ্যাটট্রিক করে ক্রিকেটবিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন ইরফান পাঠান। টেস্ট ক্রিকেটে অনেকেই হ্যাটট্রিক করেছেন। পাঠান ছাড়াও ভারতের হরভজন সিং ও যশপ্রীত বুমরার টেস্টে হ্যাটট্রিক রয়েছে। কিন্তু, টেস্ট ম্যাচের প্রথম ওভারেই হ্যাটট্রিক পাঠানের আগে কেউ করেননি। বাঁ হাতি অলরাউন্ডারের সেই বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষতই রয়েছে।

প্রয়াণ

● **কাবুস বিন সইদ আল সইদ :**

আরব বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দিন রাজত্ব করেছেন। গত ১০ জানুয়ারি মারা গেলেন ওমানের সুলতান কাবুস বিন সইদ আল সইদ। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ১৯৭০ সালে ব্রিটিশদের সাহায্যে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পিতাকে গদিচ্যুত করে ক্ষমতায় আসেন কাবুস। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। সম্প্রতি বেলজিয়াম ও জার্মানি থেকে চিকিৎসা করিয়ে দেশে ফিরেছিলেন সুলতান। সুলতান কাবুস ছিলেন অকৃতদার। তার কোনও উত্তরাধিকারী বা মনোনীত উত্তরসূরি নেই। ওমানের আইন অনুসারে রাজ সিংহাসন খালি হওয়ার তিন দিনের মধ্যে রাজ পরিবার পরবর্তী সুলতান হিসেবে কাউকে বেছে নেয়। ওমানের নতুন সুলতান হয়েছেন কাবুসের তুতো ভাই এবং দেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী ৬৫ বছরের হাইথাম বিন তারিক।

● **কোবি ব্রায়ান্ট :**

বাস্কেট বল কোর্টে বিপক্ষকে চূর্ণবিচূর্ণ করে জয় ছিনিয়ে আনার জাদু দেখিয়েই পরিণত হয়েছিলেন কিংবদন্তিতে। গত ২৬ জানুয়ারি আকস্মিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত হলেন কোবি ব্রায়ান্ট। কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ে তার হেলিকপ্টার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এই প্রাক্তন মার্কিন বাস্কেট বল খেলোয়াড়ের। তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। দুর্ঘটনার সময়ে ব্রায়ান্টের সঙ্গে সেই অভিশপ্ত কপ্টারে ছিলেন তার ১৩ বছরের কন্যা জিয়ান্না। যে ব্রায়ান্টের মতোই বাস্কেট বল খেলোয়াড় হওয়ার দিকে এগোচ্ছিল। এছাড়াও ছিলেন চালক-সহ অন্যানা যাত্রী। উল্লেখ্য, কোর্টে ক্ষিপ্রতার জন্য ব্রায়ান্টের নাম হয়ে গিয়েছিল 'ব্ল্যাক মাম্বা'।

মার্কিন মুলুকের বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা এনবিএ-র ইতিহাসে করিম আবদুল-জব্বার, শাকিল ও'নিল, ম্যাজিক জনসন, মাইকেল জর্ডানদের সঙ্গে তারকা হিসেবে একই পংক্তিতে উচ্চারিত হয় কোবি ব্রায়ান্টের নামও। ২০০৮ ও ২০১২ অলিম্পিক্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে সোনাও জিতেছিলেন কোবি। ১৯৯৬-২০১৬—দু'দশকে লস অ্যাঞ্জেলেস লেকার্সের হয়ে ১,৩৪৬-টি এনবিএ ম্যাচে তার অর্জিত পয়েন্টের সংখ্যা ৩৩,৬৪৩। এই প্রতিযোগিতায় তিনি পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি ১৮ বার এনবিএ অলস্টার খেতাব পেয়েছিলেন। ব্রায়ান্টের বাবা জো 'জেলিবিন' ব্রায়ান্টও ছিলেন বাস্কেট বল খেলোয়াড়। অবসরের পরে ২০১৮ সালে স্বল্পদৈর্ঘ্যের অ্যানিমেটেড ফিল্ম 'ডিয়ার বাস্কেট বল'-এর জন্য অস্কারও পেয়েছিলেন কোবি ব্রায়ান্ট।

● **রথীন দত্ত :**

গত ২৭ জানুয়ারি ত্রিপুরার প্রথিতযশা শল্য চিকিৎসক পদ্মশ্রী রথীন দত্ত কলকাতায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৮। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওপারে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা ছড়িয়ে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ওই সময়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তার এই অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ সম্মানও প্রদান করে।

রথীনবাবুর জন্ম অসমের মঙ্গলদৈ-এ। স্কুলের পড়াশোনা শিলং-এ। ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে লন্ডন যান এফআরসিএস ডিগ্রি নিতে। কাজ করেছেন বিধানচন্দ্র রায়ের অধীনে। ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ সচিবের দায়িত্ব থেকে অবসর নেন ১৯৯২-এ। সেই বছরই তাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়। এক সময়ে স্পোর্টস মেডিসিন কমিটির সদস্য ছিলেন।

● **তুষার কাঞ্জিলাল :**

শিক্ষকতাকে শুধু ক্লাস ঘরের চার দেওয়ালে আটকে রাখেননি। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়নে আক্ষরিক অর্থেই 'মাস্টারমশাই'-এর ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিদ্যার দেবীর আরাধনার দিনেই (গত ২৯ জানুয়ারি) প্রয়াত হলেন সেই মাস্টারমশাই তথা সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়ার উন্নয়নের কাণ্ডারি তুষার কাঞ্জিলাল। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

১৯৩৫ সালের মার্চে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে তুষারবাবুর জন্ম। ১৯৪৬ সালে চলে আসেন হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় বাবার কর্মস্থলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া মাঝপথে থামিয়ে অর্থনীতিতে স্নাতক হন। উদ্বাস্তু, খাদ্য আন্দোলনে নেমে বেশ কয়েকবার কারাবাসও করতে হয় তাকে। ১৯৬৭ সালে আদর্শগত কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। স্কুল শিক্ষকের চাকরি নিয়ে থিতু হন সুন্দরবনের গোসাবার রাঙাবেলিয়ায়।

সেই আমলে রাঙাবেলিয়া ছিল উন্নয়নের একেবারে প্রান্তিক স্তরে। সেখানে সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নের কাজ শুরু করেন তুষারবাবু। পরবর্তীকালে গড়ে তোলেন টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট। তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন পদ্মশ্রী-সহ একাধিক পুরস্কার। মাটির সঙ্গে তার যোগ ছিল আমৃত্যু।

বিবিধ

➢ ইউনিসেফ-এর তথ্য অনুযায়ী, এবছরের প্রথম দিনে বিশ্বে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৮-টি শিশুর জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭ হাজার ৩৮৫-টি শিশুই জন্মেছে ভারতে। তাতেই এক দিনে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে' প্রথম স্থান দখল করল ভারত। চিনও পিছিয়ে, বেশ অনেকটাই। সংখ্যাটা ৪৬,২৯৯।

● **বিশ্বের প্রবীণতম মানুষ :**

নিজের রেকর্ড আরও উঁচুতে নিয়ে গেলেন বিশ্বের প্রবীণতম মানুষটি। জাপানের ফুকুওকা-তে 'কানে তানাকা' গত ২ জানুয়ারি নিজের ১১৭-তম জন্মদিন পালন করলেন। গত বছরই তিনি বিশ্বের প্রবীণতম মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। সেই রেকর্ড আরও এক বছর বাড়িয়ে নিলেন কানে। গত বছরই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ফেলেন কানে তানাকা। ঘোষণা করা হয় তিনিই বিশ্বের প্রবীণতম মানুষ। ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন কানে। ১৯২২ সালে বিয়ে করেন হিদেও তানাকা-কে। প্রসঙ্গত, জাপানে জন্মহার কমছে। আর মানুষের গড় বয়স বাড়ছে।

● **বিশ্বের উচ্চতম সেতু :**

নিজেদের আগের রেকর্ড ভেঙে দিল চিন। এর আগে বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতুর রেকর্ড ছিল চিনের দখলেই। সেই রেকর্ডও ভেঙে গেল। নতুন একটি সেতু উদ্বোধন হল দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে। চিনে গুইঝউয়ের লিউপানসু ও ইউনানের জুয়ানউই-এর মধ্যে পাঁচ ঘণ্টার রাস্তাকে প্রায় দু'ঘণ্টা কমিয়ে দিলে নতুন এই সেতু। নতুন উদ্বোধন হওয়া 'ডাগ বেইপানজিয়াং' সেতুটি নিচের খাদ থেকে ৫৬৫ মিটার উপরে অবস্থিত। সেতুর দৈর্ঘ্য এক হাজার ৩৪১ মিটার। এর আগে সর্বোচ্চ সেতুর রেকর্ড ছিল চিনেরই 'সিডু নদী ব্রিজ'-এর দখলে। যেটি নিচের নদী থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উপরে অবস্থিত।

● **লম্বা চুলের গিনেস রেকর্ড :**

নিজের বিশ্ব রেকর্ড নিজেই ভেঙে দিল গুজরাতের এক কিশোরী। অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সব থেকে লম্বা চুলের রেকর্ড আগে তার দখলেই ছিল। সেই রেকর্ড আরও মজবুত করে নিলেন বছর সতেরোর নীলাংশী প্যাটেল। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম উঠেছিল আগেই। ২০১৮ সালেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সব থেকে লম্বা চুলের রেকর্ড দখল করে নীলাংশী। তখন তার চুলের দৈর্ঘ্য ছিল ১৭০.৫ সেন্টিমিটার বা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। নিজের সেই রেকর্ড টপকে এখন তার চুলের দৈর্ঘ্য ১৯০ সেন্টিমিটার বা প্রায় ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের তরফে তাকে সেই শংসাপত্রও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নীলাংশী এখন দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

বিশ্ব পুস্তক মেলায় প্রকাশন বিভাগের উজ্জ্বল উপস্থিতি

সংকলন : যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী

প্রতি বছরের মতো চলতি বছরেও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আয়োজিত নয়াদিল্লি বিশ্ব পুস্তক মেলা ২০২০-তে প্রকাশন বিভাগ ভাগ নেয়। গত ৪ থেকে ১২ জানুয়ারি, ২০২০ নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এই বইমেলা। দিনে দিনে রাজধানীর বুকে গ্রন্থ প্রকাশক, লেখক, পুস্তক বিক্রেতা তথা বইপ্রেমীদের পারস্পরিক নৈকট্য, মত বিনিময় ও মেলামেশার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে স্বনামধন্য এই মেলা।

এবছরও বিশ্ব পুস্তক মেলাতে আমাদের প্রকাশন বিভাগ মেলায় আগত পুস্তকপ্রেমী ক্রেতাদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পায়। বিক্রিবাটার পরিমাণ টাকার অঙ্কে ৫২ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। প্রকাশন বিভাগের ইতিহাসে কোনও একটিমাত্র বইমেলায় বিক্রির নিরিখে হিসাব করলে এটি এক অভূতপূর্ব রেকর্ড। মেলার দশ দিনই বিভাগের স্টল পাঠক-ক্রেতার ভিড়ে উপচে পড়ে। সমাজের সর্ব স্তরের মানুষজনই তাদের পছন্দের বইটির খোঁজে এক বা একাধিকবার ঢুঁ মেরেছেন আমাদের স্টলে।

মেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশন বিভাগের স্টলটির উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অতুল কুমার তিওয়ারি। সাথে বিভাগের একগুচ্ছ নতুন মুদ্রিত বইয়েরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শ্রী তিওয়ারি।

বিশ্ব পুস্তক মেলা ২০২০-তে আমাদের বিভাগের সাহিত্য পত্রিকা 'আজকাল'-এর ৭৫-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ''লেখক এবং সাহিত্য মঞ্চ'' শীর্ষক এক মতামত বিনিময় অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাসে, সমৃদ্ধ কৃষ্টিগত উত্তরাধিকার, গুরুত্বপূর্ণ ভাষণসম্ভার এমত বিস্তৃত বিষয়বস্তুর উপর প্রকাশিত গ্রন্থরাজি থেকে চয়ন করে পুস্তকপ্রেমীরা নিজেদের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করার সুযোগের অকাতরে সদ্ব্যবহার করেছেন।

চলতি বছরে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লি বিশ্ব পুস্তক মেলার থিম ধার্য করা হয়, ''গান্ধী : রচয়িতাদের রচনাকার''। গান্ধী সাহিত্য/রচনা প্রকাশের জগতে প্রকাশন বিভাগের অবস্থান যে একেবারে প্রথম সারিতে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্টলে সাজিয়ে রাখা বিভাগের মুদ্রিত তথা ই-ভার্সন, উভয় মাধ্যমেই মহাত্মা গান্ধী সংক্রান্ত বিপুল রচনা সম্ভার মেলায় আগত পাঠককুলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

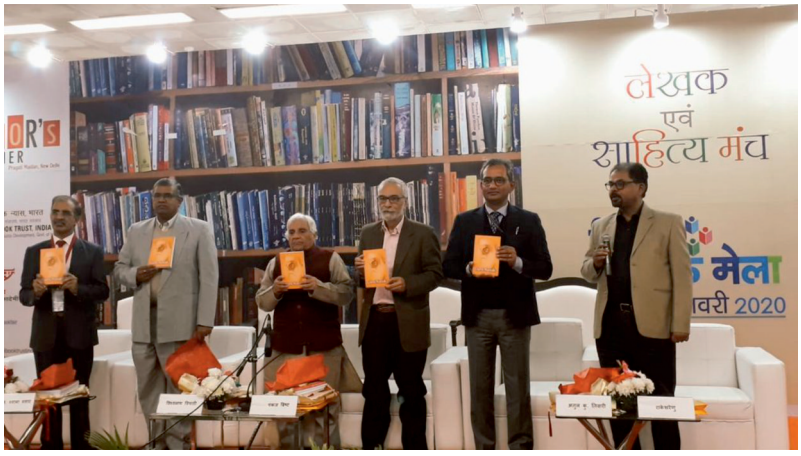

অন্যান্য বইপত্রের মধ্যে দেশের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীদের ভাষণ সংকলন; শিশু সাহিত্য, ইতিহাস ও কৃষিভিত্তিক রচনা মানুষের নজর কাড়ে।

প্রসঙ্গত, এবছর মেলায় ছয়শোরও বেশি ভারতীয় তথা বিদেশি প্রকাশক অংশ নেন। দেশের প্রকাশকরা এক হাজার তিনশোরও বেশি স্টলে হিন্দি, ইংরাজি, তামিল, তেলেগু, বাংলা, গুজরাটি, মৈথিলি, মালয়ালম, পাঞ্জাবি, সংস্কৃত, উর্দু-সহ নানা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইপত্রের সম্ভার পাঠককুলের সামনে তুলে ধরেন।❑

আমাদের প্রকাশনা

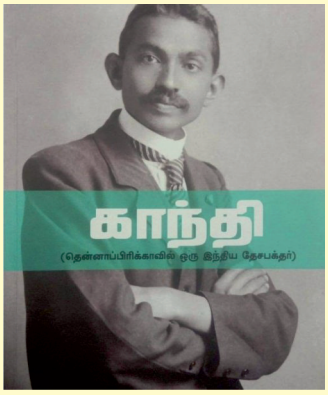

MK Gandhi : An Indian Patriot in South Afirca (তামিল)
(সংকলন - প্রকাশন বিভাগ)

গান্ধীজীর প্রথম জীবনী 'MK Gandhi : An Indian Patriot in South Africa'। যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থিতু ভারতীয়দের জন্য মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন, বইটি সেই সময়ে লেখা। প্রথমবার চেন্নাইস্থিত গান্ধী অধ্যয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় ভারত সরকারের তথ্য ও সূচনা মন্ত্রকের আওতাধীন প্রকাশন বিভাগ এটিকে তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছে।

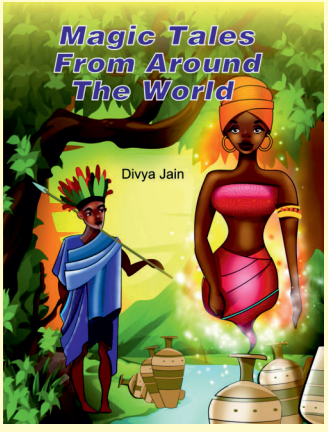

Magic Tales From Around The World
(লেখক - দিব্যা জৈন)

'Magic Tales from around the World' রচিত খুদে পাঠকদের জন্য। সারা দুনিয়ার ১১-টি গল্প নিয়ে। মূল উদ্দেশ্য মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নীতি কথার পাঠ। লেখক শিশু সাহিত্যের জগতে এক অতি পরিচিত নাম, দিব্যা জৈন।

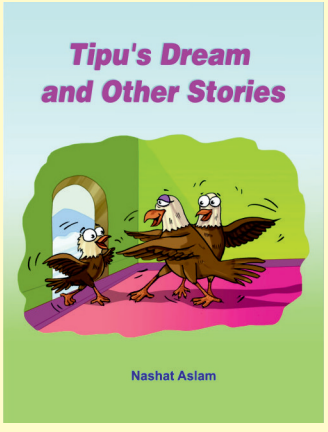

Tipu's Dream and Other Stories
(লেখক - নাশত আসলম)

'Tipu's Dream and Other Stories' শীর্ষক গল্প সংকলনটি লেখা হয়েছে ছোট্ট পাঠকদের কথা মাথায় রেখে। নাশত আসলমের ঝরঝরে ভাষায় রচিত সহজসরল এই গল্পগুলি খুদেদের মন জয় করবে।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

February, 2020
R.N.I. No. 19740/69

Celebrate Mahatma's 150th Birth Anniversary with our Gandhian Literature

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

For placing orders, please contact:

Ph : 033-2248-8030 / 2576 / 6696, e-mail : kolkatase.dpd@gmail.com

To buy online visit: www.bharatkosh.gov.in

e-version of select books available on Amazon and Google Play

website: www.publicationsdivision.nic.in

Follow us on @ DPD_India

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, কে. শ্যামা প্রসাদ কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।